# ॥ তৃষিতা ॥

সমর বসু

শরৎ পুস্তকালয়
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :

প্রণব সাহা

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :

কালীপদ ভট্টাচার্য

কো-অপারেটিভ প্রেস

১, ছিদাম মুদি লেন, কলিকাতা-৬

মূল্য আড়াই টাকা

॥ উৎসর্গ ॥

সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ এক ॥

জনার্দন কোনও দিনই ভাবতে পারে নি আবার তাকে ফিরে আসতে হবে কেতকী দিদির কাছে। আবার তাকে নতুন করে জীবন সুরু করতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে!

কিছু দিন আগে এই জনার্দনই মরে যেতে চেয়েছিল। ভেবেছিল মৃত্যু ছাড়া কিছুই তার আর পাওনা নেই। চোখের সামনে নেমে আসে অন্ধকার। অন্ধকারের সমুদ্র। আলো নেই, আশা নেই, তাই নেই বাঁচবার সাধ। জনার্দন বাঁচতে চায় নি। বেঁচে মরে থাকার চেয়ে, মরে গিয়ে বেঁচে যাওয়ায় অনেক আনন্দ, অনেক শান্তি। তাই জনার্দন মরে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু জনার্দনের মরা হল না। ফিরে আসতে হল কেতকীদিদির কাছে। লক্ষ্মণদাদার হাত ধরে যেদিন সে প্রথম ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিল, সেদিন একবারও মনে হয় নি যে, যার কাছে চলেছে তার কাছেই সারা জীবন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে।

জনার্দনের মনে আছে, সেদিনও আকাশটা এমনি ধোঁয়াটে ছিল, মরা মানুষের চোখের মত নিশ্চল থমথমে। চৈত্রশেষের আকাশ। সেদিকে তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে যায়। শন্‌শনে শুকনো বাতাস খাল-বিল-পুকুরের জল হুহু করে শুষে নিচ্ছে। আবার দুদিনেই সব খট খটে। যেমন আকাশের ছিরি, তেমনি মাটির। মাঠগুলো ফেটে চৌচির। বাতাসের হুহু শব্দের সঙ্গে ঐ ফাটলের মধ্যে যেন মনে হয় কচি ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মাটির

বুঝি আজ তেষ্টা পেয়েছে। তাই অনেক উঁচুতে ঐ ছোট্ট ফটিকজল পাখীটার মত মাটিও যেন জল চাইছে। আকাশের জল না হলে তারও তেষ্টা মিটবে না। মাটির তেষ্টা না মিটলে মানুষগুলো খাবে কি! শেয়াল-কুকুরের মত রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে। সেই সেবার যেমন পড়ে ছিল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়।

জনার্দন সেই প্রথম এল কলকাতায়। তখন এত সব কথা কিছুই সে জানতো না। আর জানবেই বা কি করে। তখন ওর বয়সই বা কত। বড় জোর দশ কিংবা এগারো।

দশ-এগারো বছরের ছেলে বাপের ওপর রাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল রুজি রোজগারের জন্যে। জনার্দনের মা নেই। পিসীমার কাছেই মানুষ। পিসীমার চোখের মণি। একমুহূর্ত চোখের আড়াল হলেই পিসীমার কাছে যেন সব আঁধার হয়ে যেত। পাড়ায় পাড়ায় চীৎকার করে ঘুরে ঘুরে পিসীমা যখন ঘরে ফিরতো, তখন দেখা যেত, জনার্দন পিসীমারই তক্তপোষের নীচে লুকিয়ে বসে আছে চুপটি করে। সেই অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে পিসীমার সেই যে বকুনি সুরু হতো, যুধিষ্ঠির ঘরে না ফেরা পর্যন্ত তা থামতো না।

জনার্দনের বাবা যুধিষ্ঠির দাস। ক্ষেত খামারের কাজ করে। নিজেরও কিছু জমি আছে, আর কিছু করে ভাগ-চাষ। বউ মরে যাওয়ার পর থেকেই মেজাজটা যেন তার কেমন খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম সে জনার্দনকে খুবই আদর করতো আর ভয় করতো বিধবা দিদিকে। কিন্তু তারপর কি যে হল, কথায় কথায় ছেলেকে মারতে ধরতে সুরু করল। আর সে কি যে সে মারধোর! কখনও হয়তো একটা আস্ত চেলা কাঠই ছুঁড়ে দিল কপাল কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত বেরুতে লাগল।

তারপর সুরু হল পিসীমার ছুটোছুটি। ডাক্তার-কবরেজ, ওষুধ-পত্তর, ফল-পাকড় নিয়ে তাঁর একরাশ পয়সা খরচ হয়ে যেত।

তাতে আরও রেগে যেত যুধিষ্ঠির। দিদির মুখের ওপর বলে দিতো—ছেলেটাকে তুমি গরু তৈরী করছো। আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খাচ্ছ।

পিসীমা জানতো, তখন কিছু বললেই যুধিষ্ঠির আরও ক্ষেপে যাবে। তাই চুপ করে থাকতো। চুক্‌চুক্ শব্দ করে শুধু বলতো—বালাই, ষাট! ও-কথা কি বলতে আছে।

গ্রামের লোকেরা কিন্তু ছেড়ে কথা কইতো না। যে-যেমন খুসী বকাবকি করতো। আর বলত—মা-মরা ছেলে, অমন মারধোর করলে কদিন বাঁচবে।

যুধিষ্ঠির সেসব কথা শুনে গুম হয়ে বসে থাকতো। হয়তো বুঝতে পারতো কাজটা সে ভাল করে নি।

গুপ্তিপাড়ার কাছেই ওদের গ্রাম। গ্রামের নাম আয়দা। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বেহুলা নদী। এখন ওখানে একটা রেলওয়ে ষ্টেশন হয়েছে—বেহুলা হল্ট। কিন্তু আগে ওটা ছিল না। আয়দার লোককে ট্রেন ধরতে যেতে হতো গুপ্তিপাড়ায়। লক্ষ্মণদাদার হাত ধরে জনার্দন কিন্তু গুপ্তিপাড়ায় যায় নি। নদী পার হয়ে হেঁটে গিয়েছিল সোমড়া বাজারে। সেখান থেকে কলকাতায়।

সেদিনের কথা আজও মনে আছে জনার্দনের। পিসীমাও তখন খুব মারধোর করতো। জনার্দন পিসীমাকে ভালকরেই জানতো। তাই যখন তখন তাকে বিরক্ত করতো। একদিন কাঁচি দিয়ে পিসীমার সমস্ত চুল কেটে দিয়েছিল। পিসীমা তখন ঘুমুচ্ছিল। কিন্তু চুলে টান পড়তেই ঘুম ভাঙলো। উঠে ভাইপোর কাণ্ড দেখে প্রথমে খানিকটা হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল। তখনও জনার্দন হি হি করে হাসছিল। সেটা পিসীমার কাছে অসহ্য লাগল। তারপর ওর মাথাটা

ধরে ঠুকে দিল দেওয়ালে। কপাল ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল। পিসীমা কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকাল না। আর সেইটাই জনার্দনের বুকের মধ্যে তীব্রভাবে বাজতে লাগল। জনার্দন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে বেড়ালো নদীর ধারে। বেশ কিছুক্ষণ পর পিসীমা' গিয়ে তাকে হাতধরে নিয়ে এল। চান করিয়ে দিল। তারপর বুড়ো ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে লাগল। তাই দেখে দূরে বসে বসে ও-বাড়ীর ছোট্ট মেয়ে সুভদ্রা হেসে উঠলো।

ও-বাড়ীর মেয়ে হলে কি হয়, এ-বাড়ীতেই সে থাকতো বেশীক্ষণ। কোনও কোনও দিন রাত্রেও বাড়ী যেত না। পিসীমার কাছে বসে বসে গল্প শুনতো। গল্প শুনতে শুনতে সুভদ্রা আর জনার্দন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়তো।

সুভদ্রা হেসে উঠতেই জনার্দন আবার কোল থেকে নেমে একছুটে চলে গেল নদীর ধারে। সেখানে ঝিনুকের ছুরি দিয়ে লক্ষ্মণ কচি কচি আম কাটছিল। আম খেতে খেতে ওরা ঠিক করলো—আর এখানে নয়। ভোরের দিকে চুপি চুপি উঠে পালিয়ে যেতে হবে।

জনার্দন জিজ্ঞেস করলো—কোথায় যাবি!

লক্ষ্মণ বলল—কেন, কোলকাতায়। সেখানে আমার মামা আছে। আমি কতবার গিয়েছি। সেখানে থাকবো, কাজকর্ম করবো। আর মাঝে সাজে এখানে আসবো।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। সত্যিসত্যি জনার্দনের সঙ্গে লক্ষ্মণও হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সোমড়াবাজারে। তখনও ফরসা হয় নি। সেই সময় গাড়ীতে উঠলো তারা। তারপর কত ষ্টেশন পেরিয়ে চলে এল হাওড়া।

লক্ষ্মণ ওর চেয়ে বয়সে বড়। এর আগেও সে দু'তিনবার এসেছে

কলকাতায়। পথঘাট কিছু কিছু তার জানাও হয়েছে। অন্ততঃ হাওড়া ষ্টেশন থেকে মাণিকতলা বাজার সে একা একা কাউকে জিজ্ঞেস না করেই হেঁটে যেতে পারে। মাণিকতলায় তার মামা থাকে। সরকারী অফিসের পিয়ন। মাথায় মস্তবড় পাগড়ী। কোমরে পাকানো পাকানো দড়ির মত জড়ানো, একটা বেল্ট তার ওপর পেতলের চাকতি।

কলকাতা এলেই লক্ষ্মণ মামার কাছে গিয়ে ওঠে। মামা তাকে বলে—এখানেই থেকে যা লখা, একটা কাজ জুটিয়ে দেবো। খাবি-দাবি বেশ মজায় থাকবি।

লক্ষ্মণ কিন্তু আগে নিজের গাঁ ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারত না। মনটা কেমন হুহু করত। আবার ফিরে যেত গাঁয়ে। জনার্দনের জন্যে কিনে নিয়ে যেত বাঁশী, ছুরি, বেলুন, আরও কত কি! জনার্দনকে লক্ষ্মণ খুব ভালবাসে! গাঁ সম্পর্কে ওরা খুড়ো ভাইপো। কিন্তু জনার্দন ওকে দাদা বলেই ডাকে।

মাণিকতলায় নীলুমামার মেসে গিয়েই ওরা উঠলো। মামা তখন অফিসে বেরিয়ে গেছে। মামার ঘরে চাবী দেওয়া।

মেসের ম্যানেজার একটা মাদুর দিয়ে বলল—এইখানে বসে থাক্। সন্ধ্যের আগেই সে ফিরে আসবে। রোদ্দুরে কোথাও ঘুরবি না। দিনকাল খুবই খারাপ।

ম্যানেজার লক্ষ্মণকে চিনতো। তাই কিছু খাবার দাবারও আনিয়ে খাওয়ালো। খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই লক্ষ্মণ বেরিয়ে গেল, যাবার সময় জনার্দনকে বলে গেল—তুই এখানে শুয়ে পড় জনা, একটু ঘুমিয়ে নে।

জনার্দনের মুখে কথা সরছিল না, শরীর ক্লান্ত, মন বিষণ্ণ। চুপ করে সে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল বাড়ীর কথা। পিসীমার কথা। বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট করতে

লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল জনার্দন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যে বেলায় নীলুমামা ফিরল অফিস থেকে। লক্ষ্মণকে দেখে খুব খুশী হয়ে বলল—আজ সারাদিন তোর কথাই ভাবছিলুম রে, লখা। তোর একটা চাকরী ঠিক করে এলুম। কালই তোকে চিঠি দিতুম। এসে পড়েছিস, ভালই হয়েছে। দেরী হলে, হয়তো আবার চাকরীটা হাতছাড়া হয়ে যেত। খুব ভাল চাকরী, বুঝলি! আমার সাহেবের বাড়ীতেই থাকতে হবে। কিন্তু তোর সঙ্গে ওটি কে?

লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—ওকে তুমি চিনবে না। ওর নাম হল জনার্দন। আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকে। যুধিষ্ঠিরদা'র ছেলে। ঐ কাজটা তুমি বরং ওকে দাও, মামা! ছেলেটা একটা কাজের জন্যেই এসেছে। আমি না হয় অন্য কোথাও জুটিয়ে নেবো।

—কিন্তু ঐটুকু ছেলে পারবে কি? একেবারে যে ছেলেমানুষ! তাতে আবার নতুন! কলকাতার পথঘাটও চেনে না!

—চিনতে কতক্ষণ। দু'দিন থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল সকালেই তুমি ওকে সাহেবের বাড়ী নিয়ে যাও। আর ওর বাড়ীতে একটা চিঠি দিয়ে দিও, নইলে ওর পিসীমা বড্ড ভাববে।

নীলুমামা চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ একবার জনার্দনকে জিজ্ঞেস করল—কিরে তুই পারবি?

জনার্দন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বলল—পারব!

লক্ষ্মণ বলল—তুমি অত ভাবছ কেন মামা, যতদিন না পারে, আমি না হয় দেখিয়ে শুনিয়ে দেবো। সাহেবকে না হয় সেই কথাই তুমি বলে দিও। কিন্তু কি কাজ করতে হবে তাতো কিছু বললে না।

নীলুমামা চুপ করেই রইল। সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল। আজ দুপুরেই টিফিনের পর সাহেব নীলকণ্ঠকে ডেকেছিলেন!

কলিংবেল না টিপে নাম ধরে ডাকলেন। নীলকণ্ঠ বুঝতে পারল যে, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কেউ হয়তো তার নামে কোনও 'কম্‌প্লেন্‌' করে গেছে। দরজার মোটা পর্দা সরিয়ে সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো নীলকণ্ঠ।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে, মোটা ফ্রেমের চশমাটা টেবিলের ওপর রেখে আমার দিকে তাকালেন অমিয়রঞ্জন। অমিয়রঞ্জন রায়। একাউন্টস্‌ অফিসার। বললেন,—হ্যাঁ হে নীলকণ্ঠ, তোমার জানাশোনা কোনও ছেলে আছে? আমার বাড়ীতে থাকবে।

ভয়ের ভাবটা এতক্ষণে কাটিয়ে উঠলো নীলকণ্ঠ। সাহেব তার মাটির মানুষ! তাকে খুবই ভালবাসেন, কিন্তু খুব গম্ভীর। তাই একটু ভয় করে। এবার সাহস পেয়ে বলল—কি কাজ করতে হবে?

পাইপটা আবার ঠোঁটে লাগালেন অমিয়রঞ্জন। সামান্য ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—বিশেষ কিছু নয়। মেয়েটাকে সঙ্গে করে স্কুলে যাবে, আবার বিকেল বেলায় নিয়ে আসবে।

এবার নীলকণ্ঠ বলল—জনার্দনকে দেখে কিন্তু মনে হয় না যে, সে ঐ কাজ পারবে। নেহাত ছেলে মানুষ, তাতে আবার হাঁদা গঙ্গারাম।

লক্ষ্মণ কিন্তু সব শুনে আরও জোর দিয়ে বলল—ওসব কাজ ওকে দিয়েই বরং ভাল হবে। নতুন এসেছে বলে অমন চুপচাপ দেখছো, দু'দিন বাদেই বুঝতে পারবে যে, সে কত ওস্তাদ ছেলে। তোমাকে মানিকতলায় কিনে আবার নতুন বাজারে বিক্রী করে দিয়ে আসতে পারবে।

অগত্যা লক্ষ্মণের কথাতেই নীলকণ্ঠ রাজী হয়ে গেল। পরদিন সকালেই জনার্দনকে নিয়ে চলে গেল সাহেবের বাড়ী।

ওকে দেখে অমিয়রঞ্জনের স্ত্রী তামসী দেবী খুব খুশী হলেন। যেন এমন একটি ছেলেই এতদিন খুঁজছিলেন তিনি। সুতরাং জনার্দনের চাকুরী জুটলো, আশ্রয়ও জুটলো।

## ॥ দুই ॥

অমিয়রঞ্জন আর তামসী দেবীর একটু বেশী বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। তামসীর বাবা ছিলেন প্রফেসর। থাকতেন দার্জিলিঙে।

অনেকদিন আগে, কোনও এক গ্রীষ্মের ছুটিতে অমিয়রঞ্জন গিয়েছিলেন দার্জিলিঙ বেড়াতে। সেখানেই লেবং রেস্‌কোর্সে তিনি একদিন আবিষ্কার করলেন তামসীকে। তামসী নামটির সঙ্গে তার দেহলাবণ্যের বৈপরীত্যই নাকি অমিয়রঞ্জনকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই সময় বন্ধুমহলে তিনি প্রায়ই এই কথাটাই বলতেন। উদাহরণ দিয়ে বলতেন—যে সব মেয়ের পুরুষানী ধরণের স্বভাব তারা মেয়েলী ধরণের পুরুষকেই পছন্দ করে বেশী। লম্বা-রোগা ধরণের মেয়েরা একটু মোটা বেঁটেসেটে ছেলেকেই ভালবাসে।

বন্ধুরা জানতেন, এসব অমিয়রঞ্জনের নিজস্ব কথা, এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য হয়তো কিছু নেই। কিন্তু তবুও কেউ আপত্তি করতেন না।

আপত্তি না করলেও আশঙ্কা করতেন এই ভেবে যে, এবার আর অমিয়কে ধরে রাখা যাবে না। এতদিন একটু একটু করে যে-জীবন সে গড়ে তুলেছিল, এরপর সেটা ভেঙে পড়বে। তার সমস্ত ছাত্রজীবন যে কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, কলেজজীবনেও যে ছিল মেয়ে-সম্বন্ধে উদাসীন, সে হঠাৎ কি করে তামসী নামে একটি মেয়ের রূপলাবণ্যে এমন গভীর ভাবে মুগ্ধ হয়ে গেল। বন্ধুরা সবাই অবাক বিস্ময়ে শুনতেন কাব্যের ভাষায় অমিয়রঞ্জনের কথা—তামসীকে জীবন সঙ্গিনী করে যে-পথে তার

যাত্রা সুরু হবে, সে-পথে সরকারী মসনদ না জুটলেও তার ক্ষতি নেই, কেননা পথ চলাতেই সেখানে আনন্দ, লক্ষ্যের প্রলোভনে নয়।

কথাগুলো কি ভেবে অমিয়রঞ্জন বলেছিলেন, তা তাঁর বন্ধুরা কেউ জানতেন না। বন্ধুদের কাছে তা প্রকাশ করারও কোন দরকার তিনি মনে করেন নি। তাঁদের ঔৎসুক্যটুকু জাগিয়ে দিয়েই তিনি চুপ করতেন। আর বন্ধুরা তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ সহ্য করতে না পেরে ভাবতেন, ছেলেটা এবার গোল্লায় গেল। এই ভেবে তাঁরা হতাশ হতেন।

অমিয়রঞ্জন শুনেছিলেন তামসীর বাবা প্রফেসর ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে তামসীর বিয়ে দেবেন না। তাঁর ধারণা, সরকারী অফিসে যাঁরা মসনদ দখল করে বসে থাকেন, তাঁরা এমন জগতের মানুষ, যেখানে মননশীলতার নাম গন্ধও নেই। সেখানে 'নো অ্যাডমিট্যান্স'। এ প্রসঙ্গে কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে একদিন অমিয়রঞ্জনের সাক্ষাত আলোচনা হয়েছিল।

রাধাকান্ত চৌধুরী অমিয়রঞ্জনের দূর সম্পর্কের কাকা। অমিয়রঞ্জন ঐখানেই উঠেছিলেন। প্রফেসর কমলাক্ষবাবু প্রায়ই সন্ধ্যায় কন্যা সমভিব্যাহারে ফরেষ্ট অফিসার মিষ্টার চৌধুরীর কোয়ার্টারে এসে বসতেন। নানারকম আলোচনা হতো। সেদিনও সরকারী অফিসারদের প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা চলছিল। অমিয়রঞ্জন এসে বসলেন সে মজলিসে। ফরেষ্ট অফিসার পরিচয় করিয়ে দিলেন, একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন—এটি হল আমার ভাইপো, অ্যাকাউন্টস্ অফিসার! ব্রিলিয়েন্ট্ ষ্টুডেন্ট। ইকনমিক্সে ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট।

মৃদু হেসে প্রফেসর বললেন—আপনার ভাইপোর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে। আপনাকে আর নতুন করে কিছু বলতে হবে না। অফিসরদের আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। ওদের ওপর আমার কোনও শ্রদ্ধা নেই। ইউনিভার্সিটির ভালো ভালো

ছেলেদের দেশ গঠনের কাজে না লাগিয়ে দেশ শাসনের ভার দেওয়ার অর্থ মূল্যবান সম্পদের নিঃসংকোচে অপচয় করা।

আসরের আর সবাই চুপ করে রইলেন। কিন্তু তামসী থাকতে পারলেন না। বললেন—দেশ গঠনের সঙ্গে শাসনের যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে, সেটাকে তো আলাদা করে ভাবা ঠিক হবে না।

তামসী জানতেন বাবার দুর্বলতা কোথায়। মেধাবী ছাত্রদের বরাবরই তিনি স্নেহ করে এসেছেন। শিক্ষিত মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় তিনি অবিচল।

তবুও তামসী এগিয়ে এসেছিল অমিয়রঞ্জনের কাছে। ভেবেছিল, বিয়ে না হয় নাই হল, বন্ধুত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হবে কেন!

অমিয়রঞ্জনও চান নি যে, সেটা ক্ষুণ্ণ হোক। তাই প্রতি বছর তাঁকে একবার অন্ততঃ যেতে হতো দার্জিলিঙে! কর্মহীন অবকাশের মুহূর্তগুলোকে উজ্জ্বল আনন্দে ভরিয়ে তুলতে।

তামসীও যেন এইটাই চাইতো। বছরের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দিত এই কটা দিনের সুখ-স্মৃতিকে রোমন্থন করে। বাধা যেখানে যত কঠিন, আকর্ষণ সেখানে তত বেশী তীব্র। মাঝে মাঝে তামসীর মনে হতো বাবার কাছ থেকে অনুমতি ভিক্ষা করেন, কিন্তু ভয়ে কিছু বল্‌তে সাহস করতেন না।

শেষ পর্যন্ত আর না বলে পারলেন না তামসী। অনুমতি চেয়ে নিতেই হল। অবশ্য তা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও ছিল না।

কমলাক্ষবাবু অবশ্য সব না শুনেই খুশী মনে অনুমতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তুই আমার একটিমাত্র মেয়ে। তোর কোনও সাধই অপূর্ণ রাখি নি। অমিয় ভাল ছেলে, করলোই বা সরকারী চাকরী, তার ওপর আমার ভরসা আছে! আমার আশীর্বাদ তাকে জানিয়ে দিস্।

এর কিছু দিন পরেই কমলাক্ষবাবু মারা গেলেন। তামসী টেলিগ্রাম করে অমিয়রঞ্জনকে ডেকে নিয়ে এলেন। তারপর

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে বেশ কিছুদিন পর তামসীকে সঙ্গে নিয়ে অমিয়রঞ্জন ফিরলেন কলকাতায়।

প্রথম আলাপের দীর্ঘ সাত বছর পরে অফিসার অমিয়রঞ্জনের ঘরণী হয়ে এলেন তামসী দেবী! তিন এলেন বাইরের জীবন থেকে, অমিয়রঞ্জনকে ঘরে টেনে এনে বন্দী করতে নয়; তাঁর সঙ্গে বাইরের জীবনেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই ঘরে-বাইরে অমিয়রঞ্জনের সুখ্যাতির অন্ত ছিল না।

বিয়ের কিছুদিন পরেই তামসী মা হলেন। কেতকী এল ওর বাপের স্বাস্থ্য আর মায়ের রূপ নিয়ে। তারও বছর তিনেক পরে অনিরুদ্ধ এল। কিন্তু তামসীর দেহ ভেঙ্গে পড়ল, যেমন দুর্বল তেমনি রুগ্ন। ডাক্তার সাবধান করে দিলেন, আর যেন সন্তান না হয় তামসীর! অবশ্য সাবধান না করে দিলেও চলতো। দুটি সন্তান পেয়ে ওঁরা দুজনেই খুব খুশী! কারো কোনও অতৃপ্তি নেই, অভিযোগও নেই।

অনিরুদ্ধকে প্যারাম্বুলেটরে চাপিয়ে বাড়ীর পাশের পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায় জনার্দন। আর কেতকীর বই শ্লেট নিয়ে সকালে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে স্কুলে, আবার বিকালে নিয়ে আসে। নতুন এক জগতে এসে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে জনার্দন। ভুলেই গিয়েছে তার পিসীমার কথা, গাঁয়ের কথা, এমন কি নীলুমামা-লক্ষ্মণদাদার কথাও। নীলকণ্ঠ অবশ্য মাঝে মাঝে সাবধান করে দিয়ে যায়। কার সঙ্গে কেমন ভাবে কথা বলতে হবে, কাকে সেলাম ঠুকতে হবে, সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যায়।

ছোট্ট একটি মেয়ে কেতকী, তার সঙ্গে জনার্দনের হয় কত কথা, কত গল্প। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেতকী জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, পাখী উড়তে পারে, মানুষ পারে না কেন? গরু-ছাগল ঘাস খায়, মানুষ ভাত খায় কেন? কুকুর যখন হাঁফায় তখন জীভটা বেড়িয়ে আসে কেন?

সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় জনার্দনকে। আর তার উত্তর শুনে কেতকী হাসে, তামসীও হাসেন, কখনও অমিয়রঞ্জনও।

সুন্দর পরিবেশে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ জনার্দন সভ্য হয়ে ওঠে। ভদ্র হয়ে ওঠে আচার ব্যবহারে, কথাবার্তায়। লক্ষ্মণ-নীলকণ্ঠের সঙ্গেও আর মিশতে ইচ্ছে করে না তার। কেমন যেন লজ্জা হয়। মাঝে মাঝে তবুও যেতে হয় ওদের কাছে। মাসের শেষে টাকা দিয়ে আসতে হয় পিসীমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। আর সুভদ্রা কেমন আছে এই খবরটা জেনে আসতে হয় চুপি চুপি।

জনার্দনকে দেখে লক্ষ্মণের ভারী কষ্ট হয়। চোখের জল মুছে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—কি'রে, আমাদের যে একেবারে ভুলেই গিয়েছিস। সাহেব বাড়ী থেকে থেকে তুইও যে সাহেব বনে গেলি।

সেই মুহূর্তে জনার্দন আর চুপ করে থাকতে পারে না, লক্ষ্মণদাকে জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি অমন করে বলো না লক্ষ্মণদা, তাহলে আমি আর ওদের বাড়ী থাকবো না।

লক্ষ্মণ বলে—ধ্যেৎ, আমি সেই কথা বলেছি নাকি! ওদের বাড়ীতে থাকবি না তো কোথায় যাবি। পাগলামী করে অমন ভাল চাকরী ছাড়িস নি যেন! পিসীমা আর যুধিষ্ঠিরদা যখন দুজনই খুশী হয়েছে তখন আর তোর ভাবনা কি!

জনার্দন তবুও ভাবতে লাগল গাঁয়ের কথা। বেহুলা নদীর চরে কত ডাক পাখী আর পানকৌড়ী আসতো। কেমন করে হাঁড়ী কলে তাদের ধরা হতো। তার পর বনে গিয়ে ফিষ্টি! সুভদ্রা সব বলে দেবে বলে ভয় দেখাতো আর জনার্দন থুথনী ধরে বলতো, তা হলে আড়ি করে দেবো।

কেতকীও মাঝে মাঝে আড়ি করে দেয়। গল্প শুনতে আসে না। মুখ ভার করে থাকে।

কিছুক্ষণ পর কর্তব্যের কথা মনে পড়তেই জনার্দন উঠে পড়ল, বলল—অনেক দেরী হয়ে গেল লক্ষ্মণদা। আমি এবার যাই।

## ॥ তিন ॥

এরপরও অনেক দিন কেটে গেছে। বাইশ বছরের জনার্দন, অষ্টাদশ বর্ষিয়সী কেতকীর দিকে চেয়ে একদিন আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ালো।

কেতকী শুধু চেয়ে দেখল কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু বুঝতে পারল না, তার চোখে কিসের কৌতূহল। কিসের জিজ্ঞাসা ওর চাপা ঠোঁটের ভীরু হাসিতে। কেতকী জানে না, কি চায় জনার্দন। জনার্দন কি লেখাপড়া শিখতে চায়। সে কি জানতে চায় এই বিরাট পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় কত নিবিড়।

এর পর কেতকী অনেক ভেবেছে। শেষে ঠিক করেছে জনার্দনকে সে শিক্ষিত করে তুলবে। তাদের পরিবারেরই যখন একজন হয়ে গিয়েছে জনার্দন, তখন সে একা কেন মূর্খ হয়ে থকবে। ভৃত্য বলে কি লেখাপড়া শেখবার অধিকার নেই তার। তা কেন হবে!

কলেজে বসে বসে এই সব কথাই ভাবছিল কেতকী। ফিরে এসেই সে সোজা ঢুকে গেল জনার্দনের ঘরে। দেখল, কোথা থেকে যেন একটা শ্লেট আর পেন্সিল জোগাড় করেছে জনার্দন। বসে বসে শ্লেটের ওপর ছবি আঁকছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কেতকী দেখতে লাগল তার আঁকার নমুনা, বুঝল আঁকার জন্যে রয়েছে নিবিড় একাগ্রতা। কেতকী যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাও বুঝতে পারে নি সে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেতকী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—কি করছ, জনার্দনদা?

জনার্দন চমকে উঠল। একটু ভয় পেয়ে গেল বোধহয়। বলল—কিছু নয়?

—দেখি তোমার শ্লেট ?

জনার্দন তাড়াতাড়ি শ্লেটটা দিয়ে অপরাধী ছাত্রের মত মাথা নীচু করে বসে রইল।

কেতকী দেখল, সত্যিই কিছু না! গাছপালা আর পাল তোলা নৌকোর মত কি একটা হিজিবিজি। পাখীর ঠোঁট, গরুর শিঙ্ আর একটা মানুষের মুখ আঁকবার চেষ্টা করেছে।

—তুমি লেখাপড়া শিখবে!

জনার্দন মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। শুধু মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ বলে ফেলল—তুমি আমাকে পড়াবে, দিদিমণি ?

কেতকী কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল—আমি পড়াবো কেন ? তোমাকেও স্কুলে ভর্তি করে দেবো।

—তা হলে আমার পড়া হবে না! ইস্কুলে আমি যাবো না।

কেতকী হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল—কেন লজ্জা করে বুঝি! আমার কাছে পড়তে লজ্জা করবে না ?

—তোমার কাছে আবার লজ্জা কিসের, তুমি তো আপনার লোক!

কেতকী জনার্দনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। দেখল বলিষ্ঠ শরীর। শিশুর মত সরল বড় বড় চোখ। চওড়া বুক। আর দাঁড়াতে পারল না কেতকী। শুধু বলে গেল—আচ্ছা, কাল থেকে তুমি আমার কাছেই পড়বে।

কেতকীর ব্যবস্থাপনায়, কেতকীর তত্ত্বাবধানে, জনার্দনের লেখা পড়া সুরু হল। গাঁয়ে থাকতে জনার্দন কিছু লেখাপড়া করেছিল, এখানে এসেও প্রথম প্রথম পড়াশুনা করতো! কিন্তু কেউ দেখিয়ে দেবার লোক ছিল না বলে উৎসাহ কমে যায়! এখন বেশ তোড়জোড় করেই জনার্দনের লেখাপড়া আরম্ভ হল।

কেতকীর সস্নেহ শাসনের তীব্র আকর্ষণে জনার্দনকে মাতাল

করে তোলে। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে। কেতকীর ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। কঠিন তপশ্চর্যায় একাজ সফল করতেই হবে। জনার্দনকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সকলকে জানিয়ে দিতে হবে যে, সে আমাদেরই একজন।

কলেজের ছুটির পর জনার্দনকে নিয়ে কলকাতার মধ্যে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত কেতকী। ওকে মনুমেণ্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, যাদুঘর দেখালো। সঙ্গে করে নিয়ে গেল ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে! জনার্দনের এসব অনেক আগেই দেখা হয়ে গেছে। বলতে গেলে, রোজই দেখেছে, কিন্তু কেতকীর চোখ দিয়ে দেখা যেন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।

ভিক্টোরিয়া কে ছিলেন? গল্প করে সেই সব কথা কেতকী বলে, আর মনোযোগী ছাত্রের মত জনার্দন চুপ করে তাই শোনে। অক্টারলনী কার নাম! যাদুঘর নাম রাখার উদ্দেশ্য কি? সব বুঝিয়ে দেয় কেতকী। জনার্দন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, আর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কেতকীর দিকে।

জনার্দন ভাবে কেতকী এখন আর তার দিদিমণি নয়, তার বন্ধু। তার অত্যন্ত আপনার লোক। কেতকীর পাশে বসে গল্প শুনতে শুনতে তার কত কথা মনে হয়। একটা মধুর দুরাশা মাঝে মাঝে তাকে যন্ত্রণা দেয়। সে ভাবে সুভদ্রা হয়তো এতদিনে কতবড় হয়েছে। কেতকীর ঢলঢলে মুখের দিকে চেয়ে জনার্দন চমকে ওঠে।

কেতকী কিন্তু ওসব লক্ষ্য করে না। সে শুধু চায়, জনার্দন মানুষ হয়ে উঠুক, একটি পূর্ণ মানুষ। কেতকীর হাতে তৈরী একটা গোটা মানুষ।

মা বলেন—তুই যে পাগল হয়ে গেলি কেতকী। অমন করে নিজের ক্ষতি করিস না, তোর নিজেরও তো পড়াশুনা আছে। সে-কথা তোর খেয়াল থাকে না কেন!

বাবা বলেন—'হবি' থাকা খারাপ নয়। তবে 'হবি'ই যদি জীবনের মেইন উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে খারাপ বলব। ওকে মানুষ করে তোলার কাজটাই যেন তোমার জীবনের প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি বোধহয় বাড়াবাড়ি করছো।

কলেজের বন্ধুরাও ঠাট্টা করে, হাসে আর বিদ্যাপতির পদাবলী শোনায়। শুধু আরতি সান্যালই কিছু বলে না, বরং কেতকীকে উৎসাহিত করে।

কেতকী কারোর ওপরই রাগ করে না। সে বুঝতে পারে না যে, এমনকি দোষের কাজ সে করেছে। তাই সে একদিন মাকে বলে—বুদ্ধিহীন মূর্খকে লেখাপড়া শেখানোর মধ্যে অন্যায় কোথায়? শিক্ষিত মানুষের কর্তব্যই তো হল অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করে তোলা।

তামসী চমকে উঠলেন ওর কথা শুনে! মনেপড়ে গেল, বাবা তো এই কথাই বলতেন। এসব কথা কেতকী পেল কোত্থেকে। মনটা আনন্দে ভরে উঠল, তবুও নিজেকে সংযত করে বললেন—অন্যায় কোথাও নেই, অন্যায় তোমার ঐ উন্মত্ততায়। তোমার লেখাপড়া শেখানোর এই নতুন পদ্ধতি হয়তো কার্যকর, কিন্তু তবুও অস্বাভাবিক। তাছাড়া তোমাদের বয়সটা হচ্ছে একটা মারাত্মক সমস্যা। আর সে সমস্যাটা যে কত জটিল, তা তুমি এখন বুঝতে পারবে না।

—আমি বুঝতেও চাই না। লেখাপড়া চর্চার সময় বয়সের হিসেবটা কেউ গুণে দেখে না। তা যদি দেখতো, তাহলে নাতনীর সঙ্গে ঠাকুরমা-দিদিমারা ম্যাট্রিক পাশ করতো না। আসলে তোমরা বলতে চাও যে, বাইরে বাইরে ওকে সঙ্গে নিয়ে আমার আর ঘোরা ফেরা চলবে না।

—হ্যাঁ, তাই যদি হয়, তাতে তোমার কিছু বলবার আছে?

—আছে, বলবো না! তবে ঘুরে ঘুরে লেখাপড়া শেখার পদ্ধতি আমার আবিষ্কার নয়। তাছাড়া জিনিসটা নতুনও নয়।

—তা নয়, জানি! কিন্তু ওকে তো একটা স্কুলে ভর্তি করেও দিতে পারিস।

—তা পারি, কিন্তু তা হলে ওতো আর আমার থাকবে না।

—মানে? চীৎকার করে উঠলেন তামসী।

—চেঁচাচ্ছ কেন? কথা বলছ, না ঝগড়া করছ? আমি চাই ওকে নিজের হাতে গড়ে তুলতে! কেতকী ধীরভাবে কথাগুলো বলে যেন ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে!

তামসী আর কিছু বলতে পারলেন না। বলতে গেলে আরও স্পষ্ট হতে হয়। তাই সংকোচ বোধ করলেন!

কেতকী চোখ নামিয়ে নিয়ে, আঙুলের সঙ্গে আঁচল জড়াতে জড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তবে কি কেতকী জনার্দনকে ভালবাসে! বিশ্রী একটা প্রশ্ন পিঠ কুঁজো করে তামসীর সামনে এসে দাঁড়ালো! প্রশ্নটার চারপাশ অন্ধকার, কুৎসিৎ, কদর্য। আর সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে ভুরু কোঁচকানো অনেক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে।

ঘৃণা, অপমান, নিন্দা! তামসী আঁচলে মুখ ঢাকলেন! অপমান থেকে তিনি বাঁচতে চান। নিন্দা থেকে রক্ষা পেতে চান! কিন্তু তবুও বিষ চিন্তাটা সাপের মত তাঁর বুকের পাঁজরাগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে জড়াতে লাগল। এ কি করে সম্ভব! এ কি কুৎসিৎ রুচি!

—মা, খোকাবাবু এখনও স্কুল থেকে ফেরে নি। আমি গিয়ে একবার দেখে আসবো! কোথা থেকে ঠিক এই সময় জনার্দন এসে ঘরে ঢুকলো। থমথমে ঘর আরও থমথমে হয়ে উঠল।

জনার্দনকে দেখে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন তামসী। ছেলের জন্যে এতটুকু উদ্বেগও মনে জাগল না। জনার্দনকে দেখ

তাঁর মনে হল তিনি যেন তাকে এই প্রথম দেখছেন, সুন্দর সুশ্রী সরল একটি তরুণ। মুখে কৈশোরের সরলতা, শরীরে তারুণ্যের ঢেউ। কালো চোখ দুটো থেকে মিষ্টি সলজ্জ কৃতজ্ঞতা যেন উপচে পড়ছে। তবুও রাগ হল তামসীর। জনার্দনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

কেতকী অন্য ঘর থেকে লক্ষ্য করল মায়ের এই অন্যায় শাসন। তবুও সে চুপ করে রইল। জনার্দনের সামনে মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া করা উচিত নয়।

জনার্দনকে সঙ্গে নিয়ে কেতকীর বাইরে বেড়াতে যাওয়া কিছুতেই বন্ধ করা গেল না। ব্যাপারটায় অমিয়রঞ্জনের হয়তো পরোক্ষ অনুমোদন ছিল। তাই অমিয়রঞ্জন বলতেন—কেতকীর বয়স কম হলেও পড়াশোনা করেছে অনেক বেশী। দেশী-বিদেশী বহু লেখকের নানা সমস্যামূলক বইও ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে সে। সুতরাং মনের দিক থেকে সে পরিণত। এমন কোনও কাজ সে করবে না যাতে নিজেই অপমানিত হয়। ওর আত্মসম্ভ্রম বোধ এত গভীর যে, আমাদের বন্ধু মহলে সে একটি আদর্শ মেয়ে বলে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। অবশ্য সুধীর সান্যাল এ-সম্বন্ধে অন্য কথা বলে। বরাবরই সে একটু সিনিক্ ধরণের। তাই ওর কথা আমরা কানে নিই না। আর সবাই বলে, স্বাধীন ভাবেই মেয়েটা যখন বড় হচ্ছে তখন ওর স্বাধীন চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটানো হয়তা সমীচীন হবে না। হয়তো এতে উল্টো বিপত্তিও ঘটতে পারে। তাছাড়া কাজটা তো খারাপ কিছু নয়।

তামসীর সমস্ত উৎসাহ নিমেষেই নিভে যায়। তিনি চেয়েছিলেন অমিয়রঞ্জন নিজে কেতকীকে বারণ করুক যে, এ-সব যা-খুশী তাই করা চলবে না। তা'হলে কেতকী আর কিছু করতে সাহস করবে না, কিন্তু অমিয়রঞ্জন উল্টো কথা বললেন।

তামসীর মনে পড়ে গেল পুরণো দিনগুলোর কথা। সে নিজেও ছিল খুব আত্ম-সচেতন। কেতকী তার মতই হয়েছে, এতো তার

গর্ব, তার গৌরব। তবুও মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। মায়ের মন বলেই বোধ হয় সব সময় কু-চিন্তা আসে।

অমিয়রঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার আগে তামসীও অনেকবার ভেবেছিলেন, বন্ধুত্ব করতে এসে অমিয়রঞ্জন তাকে বিয়ে করতে চায় কেন?

বাবার কাজ মিটে যাবার পর অমিয়রঞ্জন যখন জিজ্ঞেস করলেন—এবার তুমি কি করবে?

তামসী বলেন—এখানেই থাকবো। গার্লস্ স্কুলে একটা চাকরি জোগাড় করে নেবো!

তামসী ছিলেনও কিছুদিন সেখানে। তবে অমিয়রঞ্জনও সঙ্গে ছিল। তারপর অমিয়রঞ্জন একদিন বলেন—এবার তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—তোমার সঙ্গটা আমার কাম্য, এ-কথা তুমি জানলে কি করে?

—তোমার প্রতিদিনের আচরণ থেকে বুঝেছি!

—কি এমন ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছি যে, তুমি আমার দিকে হাত বাড়াতে চাইছ?

অমিয়রঞ্জন হেসে বললেন—তেমন কিছু নয়, তবে যেটুকু করেছ তাতেই বিয়ে ছাড়া আর অন্য গতি নেই।

সে সব কথা এখনও মনে আছে তামসীর। বিয়ের মধ্যে একান্ত করে পাওয়ার যে সামাজিক অধিকার তার জন্যে মানুষ প্রলুব্ধ হয়। নারী-পুরুষ উভয়েই। আলাপ আলোচনা করে, পাশাপাশি বেড়িয়ে, গল্প করে যে-টুকু সান্নিধ্য পাওয়া যায় তাতে অমিয়রঞ্জন তৃপ্ত হয়ে থাকতে পারে নি। হয়তো একদিন জনার্দনও পারবে না। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অতখানি উন্মত্ত হওয়া কি অমিয়রঞ্জনের উচিত হয়েছিল? তিনিও তো ছিলেন কলেজের সেরা ছেলে।

ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠলেন তামসী। ছুটে গেলেন

অমিয়রঞ্জনের ঘরে। চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি তো সেদিন বলেছিলে শিক্ষিত হলে মন পরিণত হয়।

অমিয়রঞ্জন চমকে উঠে তাকিয়ে রইলেন তামসীর দিকে। তারপর বললেন—বলো, তোমার কি অভিযোগ?

তামসী যেন আরও উৎসাহিত হলেন। বললেন—তুমি কি বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে পেরেছিলে?

অমিয়রঞ্জন বললেন—তুমিও তো সেদিন কোনও বাধা দাও নি। তোমারও শিক্ষাদীক্ষা কম ছিল না।

তামসী হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—তা'হলে বুঝতে পারছ, সেই অন্ধমুহূর্তগুলোর কাছে শিক্ষিত রুচিশীল মানুষও কত অসহায়। তবু আমাদের কথা আলাদা, কিন্তু জনার্দন আর কেতকীর কথাটা ভেবে দেখেছো?

—ভেবে দেখবার কি আছে? অমিয়রঞ্জন নিস্পৃহ ভাবে বলেন!

—কিছুই নেই! জনার্দনকে কেতকী লেখাপড়া শেখাতে চায় কেন, তা একবার ভেবে দেখেছ? ওর ধারণা জনার্দন শিক্ষিত হয়ে উঠলে, আমাদের আপত্তি করার আর কিছু থাকবে না। তখন সে যে চাকর, এ-কথা বলেও নিরস্ত করা যাবে না। ওর আধুনিক মন ঐ ভুয়ো শ্রেণী বিন্যাসে বিশ্বাসী নয়। তখন একটা কথা বললে, সে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দেবে। স্বাধীন ভাবে মানুষ করার কি কু-ফল তখনই টের পাবে তুমি। কিন্তু অতখানি গড়াবার আগেই কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। উদাস হয়ে থাকলে চলবে না। মেয়ে আমার একার নয়!

—কি করতে বল আমাকে?

—বিশেষ কিছু নয়, মেয়েটার দিকে একটু নজর রাখতে বলছি! বলতে বলতে তামসী বেরিয়ে গেলেন। হয়তো বুঝতে পারলেন অমিয়রঞ্জনকে বলে কিছু লাভ হবে না।

## ॥ চার ॥

সেদিনও রুটিন অনুযায়ী জনার্দনকে নিয়ে কেতকী বাইরে বেরিয়ে গেল। ময়দানের একটা গাছতলায় গিয়ে বসল পাশাপাশি। কেতকী গল্প বলতে সুরু করল, নেপোলিয়নের গল্প। সেই গল্প শুনতে শুনতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল জনার্দন। কেতকী জিজ্ঞেস করল—কি হল, চুপ করে কি ভাবছ! ভাল লাগছে না বুঝি।

জনার্দন বলল—না, না! বেশ ভাল লাগছে। তুমি থামলে কেন?

কেতকী আবার সুরু করল—নেপোলিয়ন ছিলেন মস্ত বড় বীর। ছোট্ট একটা দ্বীপে তাঁর জন্ম, কিন্তু প্রায় সমস্ত ইউরোপ তিনি একদিন দখল করে নিলেন। তাঁর বড় রকমের যুদ্ধ জাহাজ ছিল না বলে শেষকালে তাঁকে হেরে যেতে হল। বন্দী হয়ে থাকতে হল একটা দ্বীপে। দ্বীপেই জন্ম আবার দ্বীপেই হল মৃত্যু। অথচ সারা জীবন বিরাট সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখে গেলেন।

শুনতে শুনতে জনার্দন ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। কি খেয়াল হল, কেতকী ওর হাতটা টেনে নিল নিজের কোলে। হাতের রেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করল। গোধূলির ক্লান্ত আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু চোখের কাছে টেনে নিয়ে এল হাতটা। সামুদ্রিক বিদ্যায় যেটুকু জ্ঞান সে অর্জ্জন করেছে, নিবিষ্টভাবে তারই পরীক্ষা চলল। জনার্দনের লেখাপড়া হবে কিনা, যশ-খ্যাতি, ধন-দৌলতের কোনও ইঙ্গিত ওর হাতের পাতায় রেখায়িত হয়ে আছে কি না, সেইসব দেখছিল। ঠিক সেই সময় একটা মোটর এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। মোটর থেকে নেমে এলেন সুধীর সান্যাল।

আরতির বাবা। অমিয়রঞ্জনের বন্ধু। কেতকীর তবুও কোনও সংকোচ নেই। হস্তরেখা বিচারে তখনও সে তদ্গত চিত্ত।

সুধীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেতকী এখানে বসে কি করছ? আরে জনার্দন নাকি! তুই শুয়ে আছিস কেন?

জনার্দন তাড়াতাড়ি উঠে বসল। কেতকী কোল থেকে ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল—কাকামণি, আপনি কতক্ষণ এসেছেন। আমি ওর হাত দেখছিলাম। হেড লাইনটা খুব শার্প। ফেট লাইনও আছে। তবে মাউন্ট অফ্—

—ওঃ! তাই নাকি! তা বাড়ী ফিরবি না!

—ফিরবো একটু পরে।

সন্দেহ নয়, নিশ্চিত একটা ধারণা মিঃ সান্যালের বদ্ধমূল হল। যুক্তি তর্কের আর কোনও অবকাশই রইলো না। ফ্রয়েডীয় মতবাদ দিয়ে গবেষণা করতে হল না। এতখানি অধঃপতন। ছিঃ, ছিঃ! তামসী বৌদির মত মা, অমিয়র মত বাবা আর তাদের মেয়ের কি না এই রুচী। আর এগোতে দেওয়া উচিত নয়। কঠিন হতে হবে। অমিয় তার বন্ধু।

মিঃ সান্যাল আর বাড়ী ফিরলেন না। গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে আবার ছুটলেন এস্‌প্ল্যানেডের দিকে। রাত আটটা পর্যন্ত অফিসে থাকেন অমিয়রঞ্জন। এসময় গেলে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা হবে।

সন্ধ্যো হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তবু কেতকীরা উঠলো না। চৌরঙ্গীর রঙীন আলোগুলো দপ দপ করছে। আকাশ থেকে চাপ চাপ অন্ধকার নেমে আসছে মাঠের ওপর। আর বসে থাকা চলে না। গল্প শেষ হবার পরও ওরা চুপচাপ বসে ছিল। নীরন্ধ্র অন্ধকার, নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা ওদের দেহমনকে এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চুপচাপ বসে থাকতে বেশ ভাল লাগছিল। দূরে রঙীন আলোর ছটফটানি হঠাৎ কেতকীর মনটাকে

ধরে এমন নাড়া দিল যে, বাড়ী ফেরবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কেতকী জনার্দনকে বলল—চল এবার বাড়ী ফেরা যাক্।

জনার্দন তবুও উঠল না। বসে বসেই বলতে লাগল—তুমি একদিন বলেছিলে, পৃথিবীতে এমন এমন জায়গা আছে যেখানে ছ'মাস রাত্রি, ছ'মাস দিন। সেখানকার মানুষগুলো কিন্তু ভারী হতভাগা। তারা দিনরাত্রির লুকোচুরি খেলা দেখতে পায় না। পশ্চিম দিকে সূর্য যখন পাটে বসছে, পূব দিক থেকে তখন সন্ধ্যা আসছে তাকে ধরতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ধরতে পারল না। আর সেই অভিমানে মুখটা অন্ধকার করে, সারা রাত ধরে সে কাঁদবে। ওর কান্না দেখে সূর্য লজ্জায় লাল হবে। তারপর হাসবে। হাসতে হাসতে সে আবার পরদিন পূবদিক থেকে উঠবে।

কেতকী অবাক হয়ে শুনছিল ওর কথা। খুব ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল এই জন্যে যে, জনার্দনের দেখবার মত চোখ হয়েছে, ভাববার মত মন হয়েছে। এ-সব কিছুই তার অধ্যবসায়ের ফল। কেতকী পরীক্ষা করবার জন্যে জিজ্ঞেস করল—তা হলে সন্ধ্যা চিরকালই মুখ অন্ধকার করে বসে থাকবে। সূর্যকে ধরতে পারবে না।

—হ্যাঁ, নিশ্চয় ধরবে! কোনও কোনও জায়গায় মাঝরাত্রে সূর্য ওঠে। তার মানেই তো সূর্যের ধরা দেওয়া। দেখলে তো, আমার কেমন মনে আছে। বলতে বলতে জনার্দন উঠে পড়ল।

কেতকী ভাবলো এ-সব কথা হঠাৎ ওর মনে হল কেন। কি বলতে চাইছে সে। এই ধরণের কথা তো কোনও দিনই ওর মুখে শুনি নি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা অনেকখানি পথ এগিয়ে এল। কেতকী আর একটু সরে এল ওর পাশে। কেতকীর মনে হল তার পাশাপাশি হাঁটবার যোগ্যতা জনার্দনের আছে। জনার্দন ওর ছাত্র নয়, সঙ্গী।

জনার্দন হঠাৎ কেতকীকে ডাকল—দিদিমণি।

জনার্দনের মুখে ঐ 'দিদিমণি' শব্দটা এই মুহূর্তে যেন কেতকীর মনের ওপর চাবুক মারল। অন্য সময় যে সম্বোধনটা কেতকীর খুব ভাল লাগে, এখন সেই কথাগুলোই বিশ্রী ও বিকট হয়ে ওর কানের মধ্যে বেসুরে ঠেকল। 'কেতকী' বলে সে ডাকতে পারে না কেন! 'কেতকী' বলে ডাকবার অধিকার কি ওর নেই। ভৃত্যের কাজ করছে বলে বয়সেও সে কি ছোট হয়ে গেছে। 'দিদিমণি' ডাকটাই তো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জানিয়ে দেয় যে, সমাজের উচ্চশ্রেণীর অস্তিত্ব কত কুৎসিৎ ভাবে মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। সব জেনে শুনে এই অন্যায়কে কী করে বরদাস্ত করবে কেতকী। কেতকীর ইচ্ছে হল, এখনই সে জনার্দনকে বলে দেয়, তুমি আমায় আর দিদিমণি বলে ডেকো না। আমার শুনতে ভারী খারাপ লাগে। তুমি কেতকী বলেই ডেকো। কিন্তু মনের ইচ্ছে মনেই রইলো, মুখফুটে বলা হল না। ভয় হল, মা বাবা শুনলে কি বলবে। মা-বাবা আর তাদের বন্ধুরা, গোটা সমাজটাই চোখ রাঙিয়ে ওকে ভয় দেখালো।

জনার্দন আবার ডাকল—দিদিমণি!

ওর পাশ থেকে একটু সরে গিয়ে কেতকী বলল—কি বলো না? বারবার দিদিমণি, দিদিমণি করছ কেন?

—বলতে বড্ড ভয় করছে!

—তবে বলে দরকার নেই।

—না, না! বলতেই হবে। ভরসা দাও তো বলি! জনার্দন এগিয়ে এল।

—বেশ, ভরসা দিলাম।

—আমার খুব ভাবনা হয় দিদিমণি, তুমি যখন থাকবে না, তখন আমাকে কে পড়াবে। আমার তো এখনও কত শিখতে বাকী।

—আমি থাকবো না তো কোথায় যাবো? কেতকী মুচকি হাসি হাসল।

—দু'দিন বাদেই তো তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। তখন তুমি এখানে থাকবে নাকি।

—বিয়ে হবে! এ-সব কথা তোমাকে কে বললে শুনি?

জনার্দন বুঝতে পারল, কেতকী বিরক্ত হয়েছে। তাই ভয়ে ভয়ে বলল—বলবে আবার কে, তোমাকে দেখেই তো মনে হয়, এবার তোমার বিয়ে হবে। আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ে আরও সকাল সকাল হয়। তাই বলছিলুম, এই বেলা তুমি বরং আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও।

জনার্দনের কথায় কোনও জবাব সে দিল না। ওর কাছ থেকে আবার খানিকটা দূরে সরে এসে চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

জনার্দনের কিন্তু সে-ভাবনা নেই। কেতকী কি ভাবছে, কেন সে চুপ করে আছে, এ সব প্রশ্ন তার মনেই এল না। তাই অন্য দিনের মত একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালো জনার্দন। দরজা খুলে কেতকীকে উঠতে বলল।

কেতকীর এতটুকু ইচ্ছে ছিল না যে, এইসব কথা শোনার পরও জনার্দনের পাশে বসে ট্যাক্সি করে সে বাড়ী ফেরে। কিন্তু পাছে জনার্দন অন্যকিছু ভাবে, পাছে সে মনে করে কেতকী রাগ করেছে, তাই মুখে কিছু না বলে কেতকী ট্যাক্সির ভেতরে গিয়ে বসল।

ট্যাক্সি হু হু করে চলতে লাগল। রাস্তার একদিকে আলো ঝলমল সাজানো দোকান দেখতে দেখতে জনার্দনের চোখ ক্লান্ত হয়ে এল।

অন্যদিকে কেতকী বড় বড় গাছগুলি দেখছিল, তরা যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের দৈত্যের মত হা করে এগিয়ে আসছে। কেতকী ভয়ে চোখ বুজলো।

॥ পাঁচ ॥

কোনও প্রতিবাদ বা কোনও প্রশ্ন না করে অটুট ধৈর্য সহকারে মিঃ সান্যালের সমস্ত কথা শুনলেন অমিয়রঞ্জন। শেষে মিঃ সান্যাল বললেন—জনার্দনকে সরিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অপরিণত মনের নেশা কাটাতে হলে প্রথম প্রয়োজন বিচ্ছেদের। ঐ বয়সে যার প্রতি মনটা অনুরাগী হয়ে ওঠে, তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারলেই বাঞ্ছিত ফল ফলে। এ-সম্বন্ধে আমি অনেক বই পড়েছি। মনস্তাত্ত্বিকেরাও এই কথা বলেন। এখন যদি কোনও 'ষ্টেপ' না নেওয়া হয়, তাহলে এরপর হয়তো সমস্যাটা আরও দুরূহ হয়ে উঠবে। তখন আর আপোষ করা ছাড়া করবার কিছু থাকবে না। তাছাড়া এখন আর চাকরের প্রয়োজন কি তোমার? ছেলে মেয়ে তো সব বড় হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, আমিও সেই কথাই ভাবছি।

—এ-ছাড়া, অন্য উপায় নেই। কিছু টাকা দিয়ে ওকে বলে দাও, দেশে গিয়ে ব্যবসা করুক।

—এতে কেতকীর মনে হয় তো বিশ্রী একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

—প্রতিক্রিয়া আবার কি দেখা দেবে! বড় জোর দু'চার দিন মনমরা হয়ে থাকবে।

—কিন্তু সামনে যে ওর পরীক্ষা।

—না হয় পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ থাকবে। পরের বছর দিলেই বা ক্ষতি কি? বাইরে বেড়িয়ে আসবার একটা ব্যবস্থা করে ফেল। জনার্দনকে সেই কারণেই বাড়ী যেতে বলে দাও।

জনার্দন দেশে চলে যাবে, আর সকলকে নিয়ে তুমিও বাইরে ঘুরে আসবে, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। কেতকী বুঝতেই পারবে না যে, ওর কোনও দুর্বলতার সন্ধান আমরা পেয়েছি।

মিঃ সান্যাল চলে গেলেন। অমিয়রঞ্জন পাইপটা মুখে লাগিয়ে বসে বসে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন। কিছুতেই তিনি বুঝতে পারছেন না যে, এটা কি করে সম্ভব। একটা বিশেষ বয়সে যদি সব মেয়েদের মন এই ভাবে দুর্বল হয়ে ওঠে তাহলে আর লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জনের কি দরকার। মনকেই যদি শাসনে না রাখা গেল তাহলে পশুর সঙ্গে তার প্রভেদ রইল কোথায় ?

মিঃ সান্যালের পরামর্শে অমিয়রঞ্জনের মন কিছুতেই সায় দিতে চাইছে না। মিঃ সান্যাল বলেছেন, এ-ব্যবস্থা যদি তুমি না করতে পার, তা হলে যে-কোনও বিশ্রী অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থেকো। তোমার মেয়ের স্ক্যাণ্ডেল চার দিকে ছড়িয়ে পড়বে। পারবে তুমি সে-সব সহ্য করতে ?

বাড়ী ফিরে এসে দেখলেন কেতকী তখনও ফেরে নি। তামসীকে জিজ্ঞেস করলেন—কেতকী কোথায় ?

তামসী বিদ্রূপ করে বললেন—'কিণ্ডার গার্টেনে' শিশুছাত্রটিকে জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়েছে। কেন ? তুমি কি জান না যে, এ সময় সে কোনও দিনই বাড়ী থাকে না ?

—তা জানি !

তামসী স্তম্ভিত হয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন—তাহলে কি হয়েছে বল তো ?

অমিয়রঞ্জন ভাবতে লাগলেন তামসীকে কথাগুলো বলা উচিত হবে কি না ! মিঃ সান্যালের অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয় নি। উড়ো কথা শুনে নিজের সংসারের শান্তি নষ্ট করা

উচিত হবে না। অমিয়রঞ্জন নিরস্ত হলেন। বললেন—মেয়েটাকে যে কি খেয়ালে পেয়ে বসলো। একটু পড়া শোনাও করে না। কেবল এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ভাবছি জনার্দনকে কিছুদিনের জন্য দেশে পাঠিয়ে দেব। সে এখানে থাকলে কেতকী কিছুতেই পাশ করতে পারবে না। তুমি কি বল?

—আমি আর কি বলবো! তোমার মেয়ে তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। দেখছো তো এতখানি রাত হয়ে গেল এখনও বাড়ী ফেরবার নাম নেই। এখনও কি সে কচি খুকী আছে যে, এখানে ওখানে নেচে নেচে বেড়াবে। জনার্দনকে তুমি বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থাই কর।

—কিন্তু কেতকীকে কি বলা হবে?

—ওকে কি বলতে হবে, তা আমি বুঝবো। তোমাকে সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না।

—কেতকীকে তো চেনো, শেষকালে—

—ঈস্, মেয়েকে ভয় করে আমাদের চলতে হবে নাকি!

—ভয় নয়। ওর বয়স হয়েছে, ওরও তো একটা মতামত আছে।

—ওর মতামত নিয়ে তবে আমাদের কাজ করতে হবে?

—তা নয়, তবে সে যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, তখন আর মিথ্যা কথা বলা যাবে না।

—কি করবে শুনি?

—মনে মনে আমাদের অশ্রদ্ধা করবে। ছোট ভাববে। মুখে কিছুই বলবে না, অথচ তা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো!

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সত্যি কথা তো বলা যাবে না। মিথ্যে বলতেই হবে।

কথা বলতে বলতে তাঁরা বারান্দায় এসে বসলেন। আর ঠিক সেই সময় সদরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়ালো। একদিক দিয়ে কেতকী আর অন্যদিক দিয়ে জনার্দন নামল।

অমিয়রঞ্জন মুচকি হেসে বললেন—এই দৃশ্যকে কে কি রকম ভাবে নেবে তা বলতে পার তামসী?

—খারাপ ভাবে নিলে, আপত্তি করা যায় না। ভাল ভাবেও নেওয়া যায়।

—কিন্তু সুধীর সান্যাল দেখলে কি বলতো জান? বলতো—ওহে অমিয়, এবার মেয়েটার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর, নইলে ঐ চাকরটার সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে।

তামসী বললেন—কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু মিথ্যে নয়।

অমিয়বাবু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন—তুমিও সেই কথা বলছ।

—হ্যাঁ! তাই বলছি, কিন্তু এতে হাসির কি আছে।

—কিছু আছে বৈকি! নইলে হেসে উঠলাম কেন? তোমার বাবার কথা মনে আছে। তিনিও চাইতেন না যে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক, কিন্তু আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের দেখে তিনি কিছুতেই অসুখী হতে পারতেন না!

—সে তো বটেই। সেই জন্যেই তিনি আমাদের বিয়ের অনুমতিও দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক!

—কেতকীর সমস্যাটাও ঠিক সেই রকমেরই। সান্যালের অভিযোগ স্বীকার করে নিলে, আমাদের একটি মাত্র জিনিস শুধু ভেবে দেখতে হবে। জনার্দনকে বিয়ে করে কেতকী সুখী হতে পারবে কিনা। অর্থাৎ সুখী হওয়ার সুযোগ আছে কিনা। যদি থাকে, তাহলে কেতকী কোনও অন্যায় করছে না। ভুলও করছে না।

—থামো, আর লেকচার ঝাড়তে হবে না! বলতে বলতে তামসী চলে গেলেন।

অমিয়রঞ্জন কিন্তু উঠলেন না। বসে বসে ভাবতে লাগলেন, জনার্দনকে শিক্ষিত করে তোলার পেছনে কেতকীর যদি এ উদ্দেশ্য থেকে থাকে যে, জনার্দন তার যোগ্য হয়ে উঠুক, তাহলে তার এই উত্তম দোষের তো নয়ই, বরং প্রশংসার যোগ্য হবে।

সেলাইয়ের জিনিসপত্র নিয়ে তামসী আবার এসে বসলেন অমিয়বাবুর পাশে। বললেন—তোমার দার্শনিক চিন্তা কমাও তো! পৃথিবীটা নিরেট মাটি দিয়ে গড়া নয়।

তামসীর কথায় কান না দিয়ে অমিয়বাবু বললেন—ও-কথা তো তুমি অস্বীকার করতে পার না যে, জনার্দন অনেক সভ্য হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই অনেক কিছু শিখেছে।

—তাতে হয়েছে কি? তাই বলে, তাকে জামাই করতে হবে?

—না, তা বলছি না! তবে একথা সত্যি যে আমাদের কাছে মানুষ না হয়ে, জনার্দন যদি নিজে লেখাপড়া শিখে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনীয়ার, প্রফেসর কিংবা সরকারী চাকুরে হতো, তাহলে অনায়াসে কেতকীর সঙ্গে তুমি তার বিয়ে দিতে পারতে! জাত বিচারের বাধাটা তো আমাদের কাছে মস্ত বড় একটা কিছু নয়।

তামসী কোনও জবাব দিতে পারলেন না। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলেন।

সেই অবসরে অমিয়রঞ্জন কেতকীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। দেখলেন টেবিল ল্যাম্প জেলে খুব মনোযোগের সঙ্গে সে যেন কি লিখছে। বাবা এসেছেন তা জানতেও পারে নি সে। অমিয়রঞ্জন ভাবলেন, ওকে ডাকবেন কিনা! কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। চোর পায়ে তামসীও এসে দাঁড়ালেন তাঁর পিছনে।

কেতকী লেখা শেষ করে এদিকে তাকাতেই চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল — তোমরা কখন এসেছ ?

তামসীর মনে হল, চোরের মত যেন তাঁরা ধরা পড়ে গেছেন। কিন্তু মুহূর্তে নিজেদের অসহায় অবস্থাটাকে কাটিয়ে তাঁরা একটু এগিয়ে এলেন।

—বেড়িয়ে এসে চুপচাপ যে ঘরে এসে বসলি! আমরা কখন থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। ভাবলাম, কি জানি কি হল, যাই একবার দেখে আসি। এমন তো কোনও দিন করিস না। যাক তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। লেখা শেষ করেই আমার ঘরে চলে আসবি ! তামসী মুহূর্তে অবস্থাটাকে খুব সহজ ও স্বাভাবিক করে তুললেন।

—লেখা হয়ে গেছে। ইংরাজী নোটটা টুকে রাখছিলাম। বলতে বলতে কেতকীও ওঁদের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

সবাই তামসীর ঘরে গিয়ে বসলেন। ঠাকুরকে চা দিতে বলে দিলেন তামসী। সমস্ত ব্যাপারটা এত আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল যে, অমিয়রঞ্জন আর কোনও কথা বলবার অবকাশ পেলেন না।

কেতকী বলল—কিছু বলছ না তো, আমার অনেক পড়া বাকী আছে, তাড়াতাড়ি সেরে ফেল।

তামসীর সুবিধে হল, বাধা দিয়ে বললেন—তোমার পড়া শোনার কথাই হচ্ছিল। পরীক্ষার আর তো বেশী দেরী নেই। কি রকম মনে হচ্ছে। ভাল 'রেজাল্ট' হবে তো ? না, এ-বছর 'ড্রপ' করবি ?

—আবার একটা বছর মিছিমিছি নষ্ট হবে। এখনও তো কিছু সময় আছে, আমি তৈরী করে নিতে পারবো।

—তোর বাবা বলছিলেন, কেতকী যদি বলে তো একটা প্রফেসর রাখি।

অমিয়রঞ্জন হঠাৎ বলে ফেললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ! একজনের সঙ্গে কথাও হয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন আসবেন সন্ধ্যের দিকে।

কেতকীকে চুপ করে থাকতে দেখে তামসী বললেন—কি ভাবছিস, অসুবিধে হবে?

কেতকী স্পষ্ট বলল—হ্যাঁ।

তামসী জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

—প্রফেসরের কাছে পড়াশোনা করা আমার পোসাবে না। গড় গড় করে কতকগুলো লেকচার দিয়ে যাবেন, বুঝি না বুঝি সেগুলো মুখস্থ করতে হবে। আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখবেন। তারপর একসময় উঠে পড়বেন। জ্ঞান দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে সময়টার দিকে সব সময় নজর দিয়ে চলা যায় না। অথচ ওঁরা তাই বলেন। যেমন ক্লাসে তেমনি প্রাইভেট টিউশনীতেও।

—তা হলে, তুই কি করবি?

—নিজেই পড়বো। যদি বুঝি ঠিক তৈরী হয়েছে, তাহলে পরীক্ষা দেবো। নইলে 'ড্রপ' করবো।

তামসী বলি বলি করেও যে কথা এতক্ষণ বলতে পারছিল না, এবার সুযোগ পেয়ে সেই কথাই বলে ফেললেন—তাহলে কিছুদিনের জন্য জনার্দনের পড়াশোনা দেখানর কাজ বন্ধ করতে হবে। সে আপাততঃ নিজেই পড়ুক। না হয় আমি একটু দেখিয়ে দেব।

—ওর জন্যে তোমার অত ভাবনা কেন? ওতো আর ইউনি-ভার্সিটির ডিগ্রী আনতে যাচ্ছে না।

অমিয়রঞ্জন বুঝতে না পারলেও, তামসী বুঝতে পারলেন যে, একথার মধ্যে বিদ্রূপের ইঙ্গিত রয়েছে। তবুও চুপ করে রইলেন।

অমিয়রঞ্জন বললেন—সে কি! আমি তো ভেবেছি ওকে ডাক্তারী পড়াবো। আসছে বছরেই ও ম্যাট্রিক দেবে। তারপর আই. এস. সি. পাশ করলেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেবো।

কেতকী উৎসাহিত হল। বলল—সত্যি বলছ বাবা! কই এত দিন তো এ-সব কিছু বল নি!

—কি করে বলবো, আমি কি জানতাম যে পড়াশোনা সে এত ভালবাসে। সেদিন আমাকে এমন একটা কথা বলল যে, আমি তো শুনেই অবাক!

—তোমায় আবার কবে কি বলতে গেল সে।

—সেদিন রাত্রে আমার ঘরে জনার্দন যখন বইপত্র সব গুছিয়ে রাখছিল, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, ভাল লাগছে তো? একটুও না ভেবেই বলল, আমার অবস্থাটা হয়েছে ঠিক জীয়ল মাছের মত। দিদিমণি একটু একটু জল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু একবার পুকুরে ফেলে দিলে, দেখবেন দুদিনেই কেমন বড়সড়ো হয়ে গেছি।

ভেতরের আনন্দ উপচে উঠে কেতকীর মুখটাকে রাঙা করে তুলল। মুহূর্তে নিজের পড়াশোনার কথা সমস্ত ভুলে গিয়ে জনার্দনের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

তামসী রেগে জ্বলে উঠলেন। ভাবলেন, এক কথা বলবার জন্যে ওকে ডেকে আনা হল, আর উনি অন্য কথা ফেঁদে বসলেন। এবার সামলাবেন কি করে! এরপর জনার্দনকে তাড়ানোর কথা আর বলা যাবে? যেমন বুদ্ধি তেমনি তো হবে।

কোচ্ ছেড়ে উঠে পড়লেন তামসী। বিছানায় গিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। কেতকী বুঝতে পারল যে, মায়ের রাগ হয়েছে। জনার্দনের প্রশংসা মা সহ্য করতে পারে না। এই সব ভেবে, কেতকীও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আলোচনাটা হঠাৎ এইভাবে থেমে যাওয়াতে এবং কিছু না বলে কেতকীর বেরিয়ে যাওয়ায় অমিয়রঞ্জন অবাক হয়ে হতভম্বের মত বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর তামসীর কাছে এসে ওর পিঠের ওপর হাত রেখে অপরাধীর মত জিজ্ঞেস করলেন—কি গো হঠাৎ শুয়ে পড়লে কেন?

তামসী ওঁর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললেন—হ্যাঁ, তুমিও শুয়ে পড়ো গিয়ে। শুয়ে শুয়ে ভেবে স্থির করো এবার কি করবে। মোট কথা আমি চাই জনার্দন এখান থেকে চলে যাক। আর ওকে আমার দরকার নেই। তার ব্যবস্থা যদি না করতে পারো, তবে শেষপর্যন্ত সবকিছু সামলাবার জন্যে তৈরী থেকো। আমি কিছু জানি না। মুখটা বালিশের মধ্যে চেপে ধরে চুপ করে গেলেন।

অমিয়রঞ্জন জানলার ধারে এসে বসলেন। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, আকাশটা শুধু অন্ধকার নয়, কুয়াশায় ভরা। এতটুকু আলো কোথাও নেই। একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না। আজ কি তিথি কে জানে!—ভাবতে ভাবতে চোখ দু'টো বুজে এল। তবুও চেয়ার ছেড়ে নিজের ঘরে গেলেন না। কারণ তিনি জানেন যে, তামসীর রাগ এখনই পড়বে। আবার সে উঠবে। কি করা যায়, তাও সে নিজেই বলবে। যতক্ষণ না ওঠে, ততক্ষণ তাকে বসে থাকতেই হবে।

## ॥ ছয় ॥

তিনদিনের জন্যে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে কেতকী বেড়াতে গেল শান্তিনিকেতনে। যাবার সময় অনিরুদ্ধকে বলে গেল—জনার্দনকে একটু দেখিস্, বাইরে বাইরে আড্ডা দিয়ে যেন সময় নষ্ট করে না।

দিদির কাছ থোক অনুমতি পেয়ে জনার্দনের ওপর এবার মাষ্টারী শুরু করল অনিরুদ্ধ। যখন তখন তার ওপর হুকুম চালাতে লাগল।

কেতকী চলে যাওয়ার জন্যেই হোক, কিংবা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক জনার্দনের মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। অনিরুদ্ধের বাধা-নিষেধের হুকুমগুলোকে সে কড়া শাসন বলে মনে করল। কোনও দিন যে তার খবরাখবর রাখতো না আজ তার অত মাথা [illegible]থা কেন? তার পড়াশোনার ইচ্ছে দেখে সব সময় যে ঠাট্টা [illegible] করতো, তার কাছে বসে কিছুতেই পড়তে চাইল না আসতে পা[illegible]

কিছুতেই যেতে [illegible] ভয় দেখিয়ে বলল—দিদিকে সে সব কথা বলে দেবে।

জনার্দন বলল—দিদিমণির ঠিকানাটা আমায় দাও আমি তাকে এক্ষুণি একটা চিঠি দেবো। আমি আর এখানে থাকবো না, কালকেই দেশে চলে যাবো।

অনিরুদ্ধ হাসি চাপতে পারল না। বললে—দিদি একদিন বাড়ীতে নেই, তাতেই এতো।

—দিদিমণি কবে ফিরবে বল তো?

—জানি না, তবে বাড়ীতে বলে গেছে মাস তিন চার পরে একেবারে পরীক্ষার সময় আসবে। এখানে পড়াশোনার ভারী অসুবিধা হচ্ছিল, তাই নিরিবিলিতে পড়বার জন্যে বাইরে চলে গেছে।

—তার আবার অসুবিধা কি ? এখানেও তো খুব পড়তো।

জনার্দনের থমথমে মুখটার দিকে চেয়ে যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে অনিরুদ্ধ বলল—তোমার ভার আমার ওপর দিয়ে গেছে, তাতো তুমি জানো, সুতরাং এই তিন মাস তুমি আমারই ছাত্র হয়ে থাকবে। আমি যা বলবো, তাই শুনবে। তোমার পড়াশোনায় যদি একটুও উন্নতি না হয় তা হলে দিদি কিন্তু আমাকে আস্ত রাখবে না।

জনার্দন গুম হয়ে বসে রইল।

অনিরুদ্ধ বোধ করি প্রাণ খুলে হাসবার জন্যেই বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর মায়ের কাছে গিয়ে সব কথা বলল।

সব কথা শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন তামসী। ভাবলেন, এই সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। কেতকী ফেরবার আগেই ওকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়।

অনিরুদ্ধ কলেজে বেরিয়ে যেতেই, জনার্দন নি
তামসীর কাছে। মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ
তারপর ভয়ে ভয়ে জনার্দন বলল—মা, কিছুদিনের জ
যাবো ভাবছি, অনেক দিন তো যাই নি। বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন, একবার দেখে আসা দরকার।

তামসী লক্ষ্য করল, জনার্দনের কথা বলার ভঙ্গী অনেক বদলে গেছে। ওর দেশে যাওয়া কেন দরকার সে-সম্বন্ধে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করছে। ভাবলেন, মেয়ের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে সত্যি সত্যি জনার্দন মানুষ হয়ে উঠেছে। ভেবে গর্বও বোধ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এর আগে কবে দেশে গিয়েছিলে, মনে আছে ?

জনার্দন বলল—পিসীমা মারা যাবার পর একবার গিয়েছিলাম।

দিন পনোয়া থেকেই চলে এসেছিলাম। তারপর আর যাই নি। সেও তো প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেল।

—তোর বাবার চিঠিটিঠি কিছু পেয়েছিস্?

—না! তাইতো ভাবছি, একবার দেখেই আসি। দেশে জমি জায়গাও কিছু আছে। যাওয়া-আসা না করলে সেগুলো বেহাত হয়ে যেতে পারে।

—কত জমি আছে তা তুই জানিস্!

—ঠিক জানি না, তবে সারা বছরের ধান পেয়েও কিছু বাড়তি হতো মনে আছে। তখন সংসারটাও বেশ বড় ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তামসী। তারপর যেন অন্যমনস্ক-ভাবেই বললেন—কেতকীর মত না নিয়ে আমরা তো আর তোমাকে যেতে বলতে পারি না। সে এসে যদি রাগারাগি করে।

—দিদিমণির তো আসতে দেরী আছে। আমি এর মধ্যে ঘুরে আসতে পারবো। তাঁকে আর জানাতে হবে না। জানালে উনি কিছুতেই যেতে দেবেন না।

তামসী বুঝতে পারলেন, ছেলেটা এখনও তেমনি সরল আছে। অনির কথা বিশ্বাস করে বসে আছে। তা যাই হোক, ওকে সরাতেই হবে। জিজ্ঞেস করলেন—তা হলে কবে যেতে চাস্?

—যদি বলেন তো কালই বেরিয়ে পড়ি। মাসখানেক থেকেই চলে আসবো। বইপত্তর সব নিয়ে যাবো, পড়াশোনার ক্ষতি হবে না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন মত দিতে হল, এই ভাব দেখিয়ে তামসী বললেন—বলছিস যখন ঘুরেই আয়। সাবধানে থাকিস্। মাঝে মাঝে চিঠিপত্তর দিস্। টাকা-কড়ির দরকার হলে বলতে লজ্জা করিস না।

জনার্দন ভাবতেই পারে নি এত সহজে মায়ের অনুমতি পাওয়া যাবে। কিন্তু অনুমতি পাওয়া মাত্রই জনার্দনের সব উৎসাহ যেন কেমন নিভে গেল। দেশে যেতে আর ভাল লাগছে না তার। এখানে থাকতেও মন চাইছে না। বার বার মনে হচ্ছে, দিদিমণির সঙ্গে গেলেই ভাল হতো। মনটা ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে আসছে। দরজা জানালা বন্ধ করে, বিছানায় শুয়ে পড়ল জনার্দন। তারপর শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল আর ভাবতে লাগলো, সে পুরুষ মানুষ, বয়সও হয়েছে, কাঁদতে তার লজ্জা করে না! কান্না বন্ধ করে বিছানার ওপর উঠে বসল। ঠিক করল, সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তখন চলে যাওয়াই ভাল।

হঠাৎ অমিয়রঞ্জনের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জনার্দন।

অমিয়রঞ্জন বললেন—তোর মার কাছে শুনলাম, তুই নাকি দেশে যেতে চাস।

জনার্দন মাথা নেড়ে জবাব দিল—হ্যাঁ!

—তা ক'দিন থাকবি সেখানে?

—দেখি, এখনও ঠিক করি নি কিছু!

—বেশ, বেশ!

জনার্দন বলতে পারল না যে, এখানে আর ফিরে আসবার ইচ্ছে তার নেই।

একটু ভেবে অমিয়রঞ্জন বললেন—যাচ্ছিস যখন, কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে যা। ওখানে গিয়ে ব্যবসা-পত্তর করবি। যদি মন বসে যায় তাহলে ওখানেই না হয় থেকে যাবি! আর ভাল না লাগে তো ফিরে আসতে কতক্ষণ।

জনার্দন মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল, বাবু তার মনের কথাটা কি করে জানতে পারলেন। একটু থেমে বলল—

তা আপনি যখন বলছেন তাই করবো। কিন্তু দিদিমণি কি মনে করবে!

—সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না, তাকে আমরা বুঝিয়ে বলবো।

মিঃ সান্যালের পরামর্শ যে এত সহজভাবে কার্যকর হবে, অমিয়রঞ্জন তা ভাবতে পারেন নি। মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানালেন আর ভাবলেন ভালোয় ভালোয় সব রক্ষে হলে হয়।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। জনার্দন চলে যাবার আগেই কেতকী শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এল।

আরতির কাছ থেকে আগেই সব কথা কেতকী জানতে পেরেছিল। আরতির বাবা নাকি একদিন আরতির মাকে বলেছিলেন, অমিয়র মেয়েটা একেবারে বয়ে গেছে। শেষকালে একটা চাকরের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করলো। আজ ওকে বলে দিয়ে এলাম, যদি ভাল চাও তো চাকরটিকে বিদায় করে দাও।

কেতকী বুঝতে পারল যে, আরতি মিথ্যে বলে নি। সেদিন সন্ধ্যায় কাকামনি যে অবস্থায় ওদের দেখেছিল তাতে যে-কোনও মানুষেরই সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু সন্দেহটার সত্যি মিথ্যা যাচাই না করে কাকামনি কি করে বাবাকে পরামর্শ দিলেন যে, চাকরটিকে বিদায় করতে হবে।

আরতি বলল—তা জানি না। মোট কথা, আমার মনে হচ্ছে তুমি গিয়ে হয়তো ওকে আর দেখতে পাবে না।

—তা হলে তো আজই আমাকে চলে যেতে হয়।

—তাই যা, কিন্তু এ নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করিসনে, তাতে ফল ভাল হবে না।

—না, বাড়াবাড়ি কিছু করব না। জনার্দন দেশে যেতে চায় যাক্, কিন্তু আমাকে বাঁচবার জন্যে ওকে দেশে পাঠাতে হবে এই অপমানকর ব্যাপার আমি কি করে সহ্য করি বল্!

পাছে আরও পাঁচজন এসে পড়ে এই ভয়ে আরতি ওর হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল।

সেই দিনই দুপুরে কলকাতায় ফিরে এল কেতকী। বাড়ী এসে দেখল জনার্দন যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। মোট-ঘাট সব বাঁধা হয়ে গেছে, বাইরে একটা গাড়ীও দাঁড়িয়ে আছে।

কেতকী ওর ঘরের দিকে একবার তাকালো, কিছু বলল না। মাকেও কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। জামাকাপড় বদলে, খাবার ঘরে এসে ঠাকুরকে কিছু খেতে দিতে বলল।

কেতকীর গলা পেয়ে তামসী চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে জিজ্ঞেস করলেন—কিরে এত তাড়াতাড়ি ফিরলি, তোর তো আসার কথা ছিল কাল রাত্রে। শরীর খারাপ হয় নি তো?

কেতকী হাসল। কিছু বলল না। যেন শুনতেই পায় নি কিছু। তামসী লক্ষ্য করলেন যে, হাসিটা মুখের, মনের নয়। তবুও সহজ হবার চেষ্টা করলেন। বললেন—মুখটা শুকনো শুকনো দেখছি, ট্রেন জার্নিতে অবশ্য ওরকম হয়। আয় ঘরে আয়, কি কি দেখলি শুনি!

—তুমি যাও আমি একটু চা খেয়েই যাচ্ছি!

তামসী লক্ষ্য করলেন, জনার্দন কাপড়-জামা বদলে পোটলা-পুটলী খুলে ঘর গোচাচ্ছে। বাইরে গাড়ীটাও আর দাঁড়িয়ে নেই। বুঝলেন, জনার্দন তাহলে যাবে না। কেতকী ফিরে আসতেই তার মত বদলেছে। ব্যাপারটা তাহলে অনেকখানি গড়িয়েছে। কেতকীর কঠিন থমথমে মুখটা মনে পড়ল। তাহলে কেতকী কী

জানতে পেরেছে যে, আমরা ওকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। জেনেশুনেই কি তাড়াতাড়ি চলে এল সে।

মায়ের ঘরে এসে কেতকী জিজ্ঞেস করল—কোথায় গিয়েছিল জনার্দন। পোটলা পুটলি নিয়ে কোত্থেকে এল যেন মনে হল। বাইরে একটা গাড়ীও দাঁড়িয়ে ছিল। কেতকী যেন কিছুই জানে না।

কেতকীর প্রশ্নের সহসা কোনও উত্তর তামসী খুঁজে পেলেন না। তারপর একটু চিন্তা করে বললেন—জনার্দন কোথাও যায় নি, যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল।

—কোথায়?

—বাড়ী।

তামসীকে চুপ করে থাকতে দেখে কেতকী সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল—ওকে তোমরা দেশে পাঠাতে চাইছিলে কেন? সত্যি কথা বলবে। ঢাকাঢাকি করার চেষ্টা করো না।

মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠলেন তামসী। স্থির করলেন আর দ্বিধা নয়। এবার স্পষ্ট কথাই বলতে হবে। মেয়ের ভয়ে এতখানি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। তামসীকে শক্ত হতে হবে। বললেন—তুই খুব যে লম্বা-চওড়া কথা বলতে শিখেছিস?

কেতকী তবুও দমল না। বলল—তা বলতে পারো। কিন্তু আগাগোড়া যে বিরাট মিথ্যা ধারণার পেছনে তোমরা চলছ তাতে কখনও সত্যি বলতে পার না।

—তা হলে জনার্দনকে কেন দেশে পাঠানো হচ্ছিল, সে-কথা তোমার অজানা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

কেতকী আরও কঠিন হল, মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—কিছু কিছু ধারণা করেছি।

তামসী তবুও বিচলিত হলেন না, বললেন—মায়ের সঙ্গে এই সব নিয়ে আলোচনা করতে তোর লজ্জা করে না!

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কোনও কথা না বলেই কেতকী উঠে দাঁড়ালো।

ঠিক সেই সময় অমিয়রঞ্জন ঘরে ঢুকলেন। বললেন—কি উঠলি কেন? কি বলতে চাস বল!

কেতকী বসল। একবার মায়ের দিকে, আর একবার বাবার দিকে চাইল। তারপর সমস্ত ঘরখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখল, আলমারীর মধ্যে রয়েছে মস্ত বড় একটা 'ডল্'। ছোট বেলায় জন্মতিথি উপলক্ষে মিঃ সান্যালের দেওয়া উপহার। ডল্‌টার দিকে চেয়ে চেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে কেতকী বলল—মেয়েরা পুতুল খেলতে ভাল বাসে বলে কি সত্যি সত্যিই পুতুল হয়ে যায়?

হঠাৎ যেন একটা মস্ত বড় ঝাড় লণ্ঠন খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল মেঝের ওপর। কেতকীর তীব্র চাউনি ও তীব্র শ্লেষ অসহ্য হয়ে বেজে উঠল অমিয়রঞ্জনের কানে। তবুও অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে চুপ করে বসে রইলেন।

তামসী কিন্তু সহ্য করতে পারলেন না। কেতকীকে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু বললেন অমিয়রঞ্জনকে—পুতুল করে তুমি ওকে ঘরে সাজিয়ে রেখেছিলে, না স্বাধীনভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলে, সেইটা ওকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দাও।

আশ্চর্য সহিষ্ণু অমিয়রঞ্জন। এর পরও শান্ত গলায় কেতকীকে বললেন—মানুষ পুতুল হয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা কোনও দিনই কেউ মেনে নিতে পারে না। সুতরাং ওসব কথা না বললেও পারতিস। হয় তো আমাদের কোথাও ভুল হয়ে গেছে, তোরও যে হয় নি তা নয়। উত্তেজিত না হয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা ভাল নয় কি!

—আমার দিক থেকে আলোচনা করার কিছু নেই, বাবা। শুধু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো যে, শিক্ষাদীক্ষাটা মানুষের

শুধু বাহ্যিক অলঙ্কার না আত্মিক সম্পদ? মানুষের মনের বৃত্তি কি চিরকালই প্রবৃত্তি কেন্দ্রিক হয়ে থাকবে?

অমিয়রঞ্জন চুপ করে রইলেন। কেতকী উঠে চলে গেল, তা দেখেও যেন তিনি দেখলেন না। তামসীকে বললেন—কেতকী এত কথা ভাবে কি করে। তাহলে আমরাই কি ওর প্রতি অবিচার করছি।

ওসব কথায় কান না দিয়ে তামসী বললেন—শুনলে তো মেয়ের কথাবার্তা। যদি, ভাল চাও তো হোষ্টেলে ভর্তি করে দাও। এখানে ওদের একসঙ্গে থাকা চলবে না। আর তা না হয় তো জোর করেই জনার্দনকে পাঠিয়ে দাও দেশে।

—কলকাতা থেকে দার্জিলিঙ কতদূর তামসী? রেলপথে যেতে গেলে কত সময় লাগে? হাওড়া থেকে গুপ্তিপাড়া নিশ্চয়ই ততদূর নয়! বেহুলা হল্ট আরও কাছেই হবে! পরস্পরকে যদি ওরা সত্যি সত্যিই ভালবেসে থাকে তো দূরত্বের বাধা সেখানে কিছুই নয়।

আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয়, কেতকী জনার্দনকে ঠিক ভালবাসে না। আমরা যে আশংকা করছি সেটা হয়ত ঠিক নয়। তাই বলছি, যেমন চলছিল তেমনি চলুক, এখন আর কিছু বলে দরকার নেই। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে।

—তাহলে তুমি এক কাজ কর। তোমার সেই প্রোফেসরকেই না হয় খবর দাও। সে কেতকীর পড়াশোনা দেখুক। প্রোফেসরের সঙ্গ এই সময় অনেক কাজ দেবে।

সবই বুঝতে পারলেন অমিয়রঞ্জন। তবুও ভাবতে লাগলেন যে, এছাড়া অন্য কোনও সহজতর পথ আছে কিনা!

. .

কেতকী মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জনার্দনের কাছে গেল।

ওকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল জনার্দন। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বলল—তুমি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে, দিদিমণি। অনিদা যে সেদিন বলল, সেই এগজামিনের আগে তুমি ফিরবে, অর্থাৎ মাস দুই পরে।

—তাই তুমি দেশে চলে যাচ্ছিলে? বেশ তো যাও, কিন্তু আমাকে দেখে আবার যাওয়া বন্ধ করলে কেন? এখানে থাকার আর তোমার দরকার কি? দেশে জমি-জায়গা আছে, তাই দেখাশোনা করগে। পড়া শোনা নাই বা করলে।

জনার্দন বুঝতে পারল যে, নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছে দিদিমণি। জনার্দন জানে দিদিমণি তাকে খুব ভালবাসে। তাই তার অত রাগ। সত্যিই তো দিদিমণিকে জনার্দন ভুল বুঝেছিল।

কিন্তু এখানে থাকা বুঝি আর চলবে না। দিদিমণি আসার পর থেকেই বাড়ীর আবহাওয়া যেন বদলে গেছে। সব বুঝতে না পারলেও জনার্দনের মনে হল এর জন্যে সে-ই যেন দায়ী। এখানে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে অনেকদিন। তবুও যে এঁরা দয়া করে তাকে আশ্রয় দিয়ে লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্যে জনার্দনের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

এই কদিনের মধ্যেই জনার্দন বুঝতে পেরেছে, দিদিমণি ছাড়া এ বাড়ীর আর কেউই চান না যে জনার্দন এখানে থাকুক। এখন দিদিমণিও চলে যেতে বললে। তবুও জনার্দন জিজ্ঞেস করল—তুমি কি সত্যিসত্যিই চলে যেতে বলছ?

কেতকী চুপ করে রইল। বলতে পারল না যে, হ্যাঁ, তুমি চলে যাও! আর কোনও দিন এমুখো হয়ো না। কেতকী বুঝতে পারল, সত্যিই সে ভারী দুর্বল হয়ে পড়েছে। জনার্দনকে চলে যেতে বলার শক্তি তার নেই। জনার্দন আর এখানে থাকবে না, এ-রকম চিন্তাও সে মাথায় আনতে পারছে না। কেতকীর মনে হল,

জনার্দনের লেখাপড়ার জন্যে যত না হোক, ওর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যেই কেতকী বেশী আগ্রহশীল। কিন্তু কেন? কেতকী নিজেকেই জিজ্ঞেস করল।

তা হলে, সুধীরকাকা, মা, বাবা, বন্ধুরা সবাই যা সন্দেহ করে সেটা কী সত্যি? জনার্দনকে কী কেতকী ভালবাসে?

কেতকী আর দাঁড়াতে পারল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আসবার সময় শুধু বলে এল—তুমি ভেবে দেখ জনার্দন, এখানে থাকবে না দেশে যাবে! ভেবেচিন্তে আজ রাত্রেই আমাকে উত্তর দেবে। হ্যাঁ, আজ রাত্রেই।

জনার্দন কিছুতেই স্থির করতে পারল না যে, সে কি করবে! এখানে থাকবে না দেশে চলে যাবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সুভদ্রার কথা মনে পড়ে গেল। পিসীমা মারা যাবার সময় জনার্দন যখন দেশে গিয়েছিল, সুভদ্রা তখন গাঁয়ে ছিল না। কত বড় হয়েছে সুভদ্রা। কেমন যেন দেখতে হয়েছে। পিসীমা বলতো, সুভদ্রার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো। তোদের দুজনকে বেশ মানাবে। সুভদ্রার মা বলতো, আমার যা পোড়া কপাল অতখানি আশা আমি করতে পারি না, দিদি।

সুভদ্রার মা গাঁসম্পর্কে যুধিষ্ঠিরের বোন, মেয়েকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী চলে আসে। শ্বশুর বাড়ী থেকে কেউ কোনও খবর নেয় না দেখে ভাইয়েরা বোনকে মাথায় করে তুলে রেখেছে। ভাজেরাও খুব যত্নআত্তি করে।

সে-সব কথা মনে পড়তেই গাঁয়ে ফিরে যাবার জন্যে মনটা আকুল হয়ে উঠল জনার্দনের। হঠাৎ যেন সে বুঝতে পারল এ-বাড়ীর এঁরা ছাড়া তার আরও অনেক আপনার লোক আছে। সন্ধ্যেবেলায় তুলসী তলায় পিদ্দীম জেলে তারা তার মঙ্গল কামনা করে।

এতদিন কিন্তু তাদের কথা একবারও মনে পড়তো না। কিন্তু আজ আর না ভেবে পারলো না।

তাদের জন্যে মনটা এত ছট্‌ফট্ করে উঠছে কেন? তাদের কি কারোর অসুখ করেছে? বাবা কেমন আছে কে জানে। তাঁরও তো বয়স হয়েছে। একা রান্নাবান্না করে খেতে বাবার নিশ্চই খুব কষ্ট হচ্ছে। একবার গিয়ে দেখে আসতেই হবে। দরকার হলে দেশেই থেকে যেতে হবে। এখানে মিছিমিছি থেকে লাভ নেই।

ভাবতে ভাবতে জনার্দন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। তার মনেই রইল না যে, দিদিমাণকে আজই জবাব দিতে হবে।

রাত্রি দশটা, সাড়ে দশটা, এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করল কেতকী, তবু জনার্দন এল না। কেতকী প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল এখনই জনার্দন আসবে। তার মতামত যাই হোক না কেন, কেতকী চায় জনার্দন আসুক। কিন্তু জনার্দন এল না।

হঠাৎ কেতকী বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর চুপি চুপি জনার্দনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খোলা জানালায় উঁকি দিয়ে বুঝতে পারল যে, জনার্দন ঘুমুচ্ছে। কেতকী ভাবল, হয়তো মনে ব্যথা পেয়েছে। বেচারা একেবারে ছেলেমানুষ।

কেতকী যেমন এসেছিল তেমনি নিজের ঘরে ফিরে গেল। গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমুতে পারল না। মনে হল তার হার হয়েছে। জনার্দনকে বেঁধে রাখবার অধিকার তার নেই, শক্তিও নেই বোধ হয়।

॥ সাত ॥

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো কেতকীর। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে শুনলো যে, জনার্দন পালিয়ে গেছে।

জনার্দন যে দেশে যাচ্ছে এ-কথা কাউকে সে বলে যায় নি, যাবার আগে কারো সঙ্গে দেখাও করে নি।

জনার্দন ভালই করেছে। কিন্তু আমাকে তো বলে যেতে পারতো। সে কি ভেবেছিল, আমি তাকে বাধা দেবো। আমি তাকে জোর করে ধরে রাখবো এখানে। সেই ছোট্ট বেলা থেকে সে আমাকে দেখছে, তবু এখনও কি সে আমাকে চিনতে পারে নি। কিংবা চিনতে পেরেছে বলেই চুপি চুপি চোরের মত পালিয়ে গেল।

কেতকীর করবার কিছু নেই। একবার মনে হল নিজের কাছে সে খুব ছোট হয়ে গেছে। পরক্ষণেই মনে হল এই হয়তো ভাল হল। বিশ্রী একটা বিপদের হাত থেকে কেতকী হয়তো রক্ষা পেয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য! মা-বাবা, এমন কি অনি পর্যন্ত কেউই কেতকীকে জিজ্ঞেস করল না যে, জনার্দন কোথায় গেছে! কেতকী ভাবতে লাগল, মা-বাবা কি রাত্তিরে উঠে জনার্দনকে যেতে বলে দিয়েছে। কেতকী হয়তো তখন ঘুমুচ্ছিল। কেতকীর মনে হল, তার চার পাশে একটা বিশ্রী ষড়যন্ত্র চলছে।

জনার্দন এ সংসারে অনেকদিন ছিল, আজ নেই। আর হয়তো কোনও দিনই থাকবে না। এই সত্যের কারণ অনুসন্ধান করে কোনও লাভ নেই।

কেতকী নিজেকে সংযত করল; মা-বাবার কাছে আত্মসমর্পণ

করত। সে বুঝতে পারল জনার্দনের জন্যেই সংসার থেকে সে একদিন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। অন্ধ বুদ্ধির বেড়াজাল দিয়ে সেখানে সে এক বিচিত্র রাজ্য গড়ে তুলেছিল। স্বেচ্ছাবিহারীর মত সে একদিন একা একা ঘুরে বেড়াত। আর নয়। এতদিনে মুক্তি পেয়েছে কেতকী।

সংবাদের অবস্থাটা ক্রমশঃ যখন স্বাভাবিক হয়ে উঠল, তখন একদিন অমিয়রঞ্জন তাপসীকে জিজ্ঞেস করলেন—প্রোফেসর রাখবার আর প্রয়োজন আছে কি।

তাপসী বললেন—কেতকীকে দেখলেই বোঝা যায় যে, ভেতরে ভেতরে সে ভারী মুষড়ে পড়েছে। উৎসাহ নেই কোনও কাজে, যন্ত্রের মত কলেজে যায়। বই নিয়ে পড়তে বসে। খায় দায় আর ঘুমোয়। একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। তাই আমি আরতিকে রোজ বিকালে আসতে বলে দিয়েছি। সমবয়সী বন্ধু পেলে মনটা অনেক হাল্কা হতে পারে। দরকার হলে প্রোফেসরও রাখতে হবে বৈকি।

পরীক্ষার আর বেশী দিন বাকী নেই। অথচ পড়াশোনা ভাল তৈরী হয় নি। পরীক্ষায় বসবে কি না, সেই কথাই কেতকী ভাবছিল। শুধু মন নয়, সমস্ত শরীরও যেন তার ভেঙে পড়েছে। একটু পরিশ্রমেই সব অবসন্ন হয়ে আসে। অনেক চেষ্টা করেও কেতকী স্থির হতে পারে না। মাঝে মাঝে নিজের ওপরই প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, সংসার থেকে দূরে সরে গিয়ে একা একা থাকতে। যে-কোনও অফিসে একটা চাকুরী নিয়ে কোনও হোস্টেলে গিয়ে থাকতে পারলে কেতকী বাঁচে। বন্ধু বলতে ঐ একমাত্র আরতি। তা। কাছেও যেন সব কথা বলা যায় না। এ-কথা বলবারও নয়।

আরতি ঘরে এসে ঢুকতেই কেতকী বুঝতে পারল বিকেল হয়ে গেছে। ক'দিন থেকে রোজই বিকেলের দিকে আরতি আসে। গল্পগুজব করে আবার চলে যায়।

চেয়ারে বসেই আরতি জিজ্ঞেস করল—কি রে, পরীক্ষা দিবি তো ?

কেতকী হাসল। হেসে বলল—হঠাৎ যে এ-প্রশ্ন করছিস! তুই কি সেইটাই ধরে নিয়েছিস।

—ধরে নেবো কেন! পড়াশোনা করতে দেখি না, তাই বলছি! হ্যাঁ রে, তোর কি হয়েছে বলতো ? আমাকেও বলবি না ?

কেতকী চুপ করে রইল। বুঝতে পারল যে, আরতি অভিমান করেছে, তবুও মুখ খুলল না। খুলতে পারল না।

আরতি ওর হাত দু'টো নিজের কোলে টেনে নিয়ে বলল—এই রকম করে নিজের ক্ষতি করিস না কেতকী। এমনি করে গুমরে গুমরে থেকে কি চেহারা হয়েছে, তা দেখেছিস।

কোনও ক্রমে উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করে কেতকী বলল—চেষ্টা তো করি। কিন্তু পারি না, ভাই। এমনভাবে আমি যে হেরে যাবো, তা কোনও দিনই ভাবতে পারি নি।

—থাম তো! হার-জিত আবার কিসের। তুই কি হার-জিতের ভাবনা নিয়ে কাজে নেমেছিস।

—তা নয়, তবে শেষ পর্যন্ত যে এরকম একটা কাণ্ড ঘটবে সেটা একদম আশংকা করি নি। আচ্ছা আরতি, একটা কথা সত্যি করে বলবি ? আমার জন্যে তোর খুব কষ্ট হয়, না রে ? আমি যদি পরীক্ষা না দিই, পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দিই, তা হলে তুই কি করিস।

—তা হলে আমাকেও সব ছেড়ে দিতে হবে। মনে নেই একসঙ্গেই পড়বার সংকল্প নিয়ে আমরা কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ?

—কিন্তু পড়তে যে আর ভাল লাগে না, ভাই।

—এক কাজ করা যাক্। প্রোফেসর ব্যানার্জিকে বলা যাক পড়াবার জন্যে। উনি সব subject-ই পড়াতে পারবেন। অমন ভাল প্রোফেসর আমাদের কলেজে আর একটাও নেই। এখনও তো মাস তিনেক সময় আছে। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। ওঁর কাছে পড়লে দেখবি, ভালই লাগবে। অত্যন্ত তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে সারা জীবনটাকে তুই নষ্ট করতে চাস্?

—আমার কিছুই ভাল লাগে না।

—তুই যদি পরীক্ষা না দিস্ তা হলে আমিও দেবো না।

—না, না! আমার জন্যে তুই কেন তোর ভবিষ্যৎ নষ্ট করবি!

—আমার খুশী, আমার ওপর তোর কোনও জোর আছে নাকি?

—ভাগ্যিস তুই ছিলি নইলে আমার কি হতো বলত! মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি ভারী একা। তুই না থাকলে আমি কিছুতেই বাঁচতাম না।

—তুই যে এতো 'সেন্টিমেণ্টাল' তা জানতাম না। তোর সেই যুক্তিবাদী মনটা কোথায় গেল? সব জিনিসকে জনার্দন চুরি করে নিয়ে গিয়েছে নাকি?

—আবার তাকে নিয়ে টানছিস কেন?

—রাগ করিসনে ভাই, আমি ঠাট্টা করছি।

—তুই তো এখনও ছেলেমানুষ রয়েছিস। কিন্তু আমি এতো শীগগির কি করে বুড়ি হয়ে গেলাম বল তো? কোনও কথাই আমি হাল্কা ভাবে নিতে পারি না। এখন হাল্কা কথা বলতেও পারি না।

—সব মানুষ কি সমান হয়। তুই তো গোড়া থেকেই 'সিরিয়স্'। ও-সব কথা থাক, এখন আমি যা বললাম তাই কর। চল কালই প্রোফেসরের কাছে যাই। নতুন প্রোফেসর, সবে নাম হচ্ছে। একটু জোর করলেই রাজী হয়ে যাবে।

—তুইও পড়বি তো ?

—সে দেখা যাবে। এখন তো তোর জন্যে নিয়ে আসা যাক।

আরতি চলে গেল। কেতকী ওকে এগিয়ে দিয়ে এল রাস্তায়। ফেরবার সময় নজর পড়ল জনার্দনের ঘরের দিকে। কিন্তু মনের মধ্যে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি হল না। আরতি যেন ওকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

নিজের ঘরে না গিয়ে কেতকী এল মায়ের কাছে। দেখল বাবাও সেখানে রয়েছেন। চেয়ারে বসতে বসতে কেতকী বলল—আরতি বলছিল, প্রোফেসর ব্যানার্জিকে রাখবার জন্যে। সময় তো আর বেশী নেই, ওঁর কাছে একটু দেখেশুনে নিলে ভাল হতো।

অমিয়রঞ্জন কৌতূহল প্রকাশ করে বললেন—দেখ দেখি আরতি তোকে কত ভালবাসে! অবশ্য আমরাও সেই কথাই ভাবছিলাম। বেশতো, তোরা দু'জনেই যা না, গিয়ে ওঁর সঙ্গে সব ব্যবস্থা ঠিক করে আয়।

তামসী এতক্ষণ নিজের সাফল্যের কথা ভাবছিলেন। আরতিকে দিয়ে যে এ-কাজ সম্ভব হবে সেটা মনে মনে তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি এতো খুশী হয়ে উঠেছেন। অথচ এই আরতিকে তিনি কোনদিনই সহ্য করতে পারতেন না। আজ কিন্তু ওকেই বার বার ডাক দিতে হচ্ছে। এই ক'দিনেই তামসী বুঝতে পেরেছেন যে, আরতির স্বভাবটাই শুধু মধুর নয়, আরতির বুদ্ধি আছে, আরতি ধীর-স্থির। বাইরে হয়তো একটু চটুল, তা ঐ বয়সে বিশেষ বেমানান লাগে না। কিন্তু ভেতরে সে খুব সংযত, নম্র, লাজুক।

তামসীই আরতিকে বলে দিয়েছিলেন প্রোফেসর রাখার কথা বলতে। প্রোফেসর রাখলে পড়াশোনায় মন বসবে, আরতি শুধু এইটুকুই ভেবেছিল। তামসীর কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়

আর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তামসীর দৃঢ় বিশ্বাস, ওর উদাসী মনটাকে গৃহমুখী করতে হলে তরুণ প্রোফেসরের সান্নিধ্য চাই। জনার্দনের কাছ থেকে ওর মনটা তা হলে ফিরে আসবে। শুধু তাই নয়, জীবনের মাধুর্যও উপলব্ধি করতে পারবে। দেহে-মনে মেয়েটা আবার বেঁচে উঠবে।

কেতকীর মুখের দিকে চেয়ে তামসী উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—আমি জানতাম তুই এই কথাই বলবি। দাদুর মত তুইও পড়াশোনা পেলে আর কিছুই চাস না। পড়াশোনা ছেড়ে তুই কি থাকতে পারিস। যাক্ প্রোফেসর এলে যদি সুবিধে হয় মনে করিস তা হলে তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে। কালই তোরা চলে যা, সব ঠিক করে আয়।

॥ আট ॥

কেতকীদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে জনার্দন সোজা চলে এল মাণিকতলায়। সেখান থেকে বিকালের গাড়ী ধরে গেল দেশে। যখন বাড়ী পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যে। গ্রাম নিঝুম হয়ে পড়েছে। মাঠের পথ গ্রামে এসে শেষ হয়েছে। রাস্তার ধারেই মুদিখানার দোকান। সেখানে কয়েকজন লোক বসে ছিল, তারা কেউ চিনতেই পারল না জনার্দনকে। জনার্দন কিন্তু খুব সহজেই যুগল আর নন্দকে চিনতে পারল। যাই হোক জনার্দন যুগল কিংবা নন্দ কাউকেই ডাকলো না। ওরা চিনতে পারে নি ভালই হয়েছে। জনার্দন তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে গেল।

জনার্দন বাড়ী গিয়ে দেখে বাবা যুধিষ্ঠির শুয়ে আছে বিছানায়, মাথার কাছে বসে আছে সুভদ্রা। সে বসে বসে পাখার বাতাস করছে। আর রান্নাঘরে তার মা পথ্য তৈরী করছেন।

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাকে বলল--দেখ মা, বলা নেই, কওয়া নেই, কে একটা লোক এসে ঘরে ঢুকেছে।

জনার্দন তখন বাবার পাশে এসে বসেছে। বাবা ঘুমুচ্ছেন দেখে জনার্দন বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল, একগলা ঘোমটা টেনে ও-বাড়ীর পিসী রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে হাসি চাপতে পারল না জনার্দন। সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রাও মায়ের আঁচল ধরে তার পেছনে লুকিয়ে পড়ল। এবার জনার্দন বলল—সে কি পিসী, ভয় পেয়ে গেলে নাকি? আমাকে চিনতেই পারলে না? আমি জনু গো।

ঘোমটা যেন এমনিতেই খসে পড়লো। একটু এগিয়ে সুভদ্রাকে সামনে বেরিয়ে আসবার সুযোগ করে দিয়ে বলল—তাই বল, আমরা ভাবলুম, এই ভরসন্ধ্যে বেলায় আবার কে এসে হাজির হল! দেখ মেয়ের কাণ্ড, তোর জনুদাকে এরই মধ্যে ভুলে গেলি।

—বাবার কি হয়েছে পিসী!

—ক'দিন ধরে তো খুব জ্বরে ভুগছেন।

সুভদ্রা তালপাতার আসন পেতে জনার্দনকে বসতে বলে, মায়ের কাছে গিয়ে বসল।

—রোগটা কি খুব বেঁকে গেছে?

—তা জানি না, তবে গুপ্তিপাড়া থেকে সেন ডাক্তারকে আনা হয়েছিল। তাছাড়া বয়সও তো হয়েছে। তা তুই এসে পড়েছিস, ভালই হয়েছে। আজই ভাবছিলুম তোকে একটা চিঠি দেবো। আর চিঠি দিলেই বা কি হতো! নিজের খেয়াল না হলে তো আসতিস না। নে, হাত মুখ ধুয়ে নে, আমি চা বসাই।

সুভদ্রাকে কানে কানে কি যেন বলল পিসী। অমনি সুভদ্রা লম্ফ নিয়ে রান্নাঘর থেকে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। জনার্দন দেখল সুভদ্রা অনেক বড় হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে লম্ফ হাতে করে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার মধ্যে কি যেন দেখল জনার্দন। ঐ দিকেই ঠায় চেয়ে রইল। ভারী ভাল লেগেছিল ওর ঐ চলে যাওয়া। কিছুক্ষণ পর বলল—সুভ্রু আমায় চিনতে পারল না পিসী! আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

—চিনবে কি করে? চেনবার কি কিছু রেখেছিস। এতো লম্বা চওড়া হয়ে গেছিস। ভদ্দর ভদ্দর চেহারা হয়েছে, রঙটাও যেন ফর্সা হয়েছে। আমিই চিনতে পারি নি আর সুভ্রু। দেখবি দাদাও চিনতে পারবে না। সেই কতটুকু তোকে দেখেছিলুম, বলতো? তারপর এই দেখা। দিদির কাজের সময় শুনলুম একবার

এসেছিলি। তখন আবার আমরা এখানে ছিলুম না। সুভুকে তুই নিজে চিনতে পেরেছিলি, যে অত কথা বলছিস।

—সত্যি পিসী প্রথমে চিনতে পারি নি। কত বড় হয়ে গেছে। আমার ভারী লজ্জা করছিল। তোমাকে রান্নাঘরে না দেখলে, আমি হয়তো ঘরে ঢুকতেই পারতুম না।

—হাঁরে, বিছানা-পত্তর বাক্স-প্যাঁটরা সব নিয়ে চলে এলি যে। এখন তা হলে থাকবি কিছুদিন।

—কিছুদিন কিগো! একেবারে চলে এলুম। আর যাবো না। কাজ ছেড়ে দিয়েছি। শহরে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। কিছুদিন থেকে গাঁয়ের জন্যে মনটা ছটফট করছিল।

—তা বেশ, ভালই করেছিস। দাদাও শেষকালে তোকে দেখে যেতে পারবে। জমি জায়গাও সব বুঝে নেওয়া দরকার।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে সাংসারিক কথা হল। সংসার ছাড়িয়ে প্রসঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল গাঁয়ের মধ্যে এর ওর খবর জানবার জন্য, তারপর আবার ফিরে এল নিজের আস্তানায়।

এরই মধ্যে সুভদ্রা মুড়ি, গুড় আর চা নিয়ে এসে জনার্দনকে খেতে দিল।

জনার্দন বুঝতে পারল, অনেকদিন পরে হলেও তাকে ফিরে আসতে দেখে এরা খুব খুশী হয়েছে।

নিজের পিসীর পাশে ছোটবেলা থেকে সুভুর মাকেও দেখে আসছে জনার্দন! পাশেই ওদের বাড়ী। জনার্দনের সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা নেই, কিন্তু আত্মীয়ের চেয়েও ওরা অনেক বেশী আপনার।

ক্রমশঃ আরও আপনার জন হয়ে উঠল ওরা। যুধিষ্ঠিরকে দেখাশোনা করা, জনার্দনের জন্যে রান্নাবান্না, সবই ওদের করতে হয়। সুভু তো রাতদিন এ-বাড়ীতেই থাকে।

জনার্দন মাঠে কাজ করতে যায়, ফেরে সেই সন্ধ্যেবেলায়। সুভু তখন সন্ধ্যে দিয়ে দাওয়ায় বসে তারই জন্যে অপেক্ষা করে। জনার্দনের হাত-পা ধোয়া হলে, তাকে চারটি খেতে দিয়ে তবে সে ছুটি পায়। তারপর জনার্দন বাপের কাছে গিয়ে বসে।

যুধিষ্ঠির চোখ মেলে জনার্দনের দিকে চেয়ে থাকে। কত কথা বলতে চায়, কিন্তু পারে না। শীর্ণ পাণ্ডুর এক টুকরো মরা হাসি ঠোঁটে লেগে থাকে শুধু।

একদিন জনার্দন জিজ্ঞেস করল—কি কষ্ট হচ্ছে, বাবা ?

যুধিষ্ঠির ধুঁকতে ধুঁকতে বলে—কষ্ট! না, আর আমার কোনও কষ্ট নেই। তোকে যখন আবার ফিরে পেয়েছি, তখন আর কোন দুঃখ নেই।

জনার্দন মাথায় বাতাস করতে থাকে। বাতাস করতে করতে সুভদ্রার কথা ভাবে।

সুভদ্রাকে দেখা পর্যন্ত বারবার কেতকীর কথা মনে পড়ছে জনার্দনের। কেতকীর সঙ্গে সুভদ্রার কোথাও মিল নেই, বরং অমিলটাই বেশী। কেতকীর মত অত সুন্দরও নয় সুভদ্রা। তবে কেতকীর চেয়ে স্বাস্থ্য অনেক ভাল। কেতকীর মত অত লেখাপড়া করে নি, কিন্তু কেতকীর চেয়ে সংসারের কাজকর্ম ভাল জানে। পরস্পরের তুলনাই চলে না, তবুও সুভদ্রাকে দেখলে কেতকীর কথাই মনে পড়ে।

একদিন সুভদ্রাকে সে বলেই ফেলল কথাটা। শরীরটা ভাল ছিল না বলে সেদিন জনার্দন বাইরে বেরোয় নি। বিকেল বেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে বসে বই পড়ছিল। তখন সুভদ্রা এল। গা-হাত ধুয়ে রঙীন একটা ডুরে শাড়ী পরেছে। কপালে টিপ। খোঁপায় গোঁজা একটা মস্ত বড় গাঁদা ফুল। দাওয়ায় উঠে একেবারে

জনার্দনের পাশে এসে বসল। জিজ্ঞেস করল—এত মোটা মোটা বই তুমি পড়তে পার? এত লেখাপড়া শিখলে কবে?

—দিদিমণি আমায় রোজ পড়াতো।

—তাই নাকি! কত করে মাইনে নিতো?

—এক পয়সাও না। আমি ছিলুম ফ্রি ছাত্তর। তুই পড়বি? আমি তোকে পড়াতে পারি।

—আমি আর পড়ে শুনে কি করবো! তবে তুমি যখন বলছ, তখন একটু আধটু না হয় শিখে নেব। কিন্তু এত মোটা বই পড়তে পারবো না।

বই মুড়ে রেখে জনার্দন এবার সুভদ্রার মুখের দিকে চাইল। সুভদ্রার শরীরের বাঁধুনি দেখে জনার্দন মুগ্ধ হল। বলল—কেতকী দিদিকে দেখলে তুই অবাক হয়ে যেতিস। কত বই পড়ে, কত গল্প জানে। আমাকে রোজ বেড়াতে নিয়ে যেত। তোকে দেখে বারবার তার কথাই মনে পড়ছে।

—সে আবার কি! ঠাট্টা করছ। কিসে আর কিসে! আমি হলুম গেঁয়ো মুখ্যু মেয়ে, আমার সঙ্গে আবার কারো তুলনা হয় নাকি!

—সত্যি হয় না! কারো সঙ্গে তোর তুলনাই হয় না! চল একটু বেড়িয়ে আসি।

—এখন আবার কোথায় বেড়াতে যাবো?

—কেন, নদীর ধারে।

—তোমার সঙ্গে? এখুনি তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে! গাঁয়ের লোকে দেখলে বলবে কি!

—কি আবার বলবে! তারা তোকেও চেনে, আমাকেও চেনে।

—না, আমার ভারী লজ্জা করছে। তুমি বরং একাই যাও।

—একা একা তো এতক্ষণ ছিলুম! চল সন্ধ্যের আগেই না হয় ফিরে আসবো।

সুভদ্রা আর আপত্তি করতে পারল না। আপত্তি করার ইচ্ছেটা গোড়া থেকেই ছিল না। শুধু ভয় পাচ্ছিল গাঁয়ের লোকের কথা ভেবে।

কোঁচার খুটটা কোমরে জড়িয়ে, গায়ে একটা গেঞ্জী গলিয়ে নিয়ে জনার্দন বেড়িয়ে পড়ছিল।

সুভদ্রা বলল—ঠাণ্ডা লাগবে, চাদরটা নাও!

আলনা থেকে চাদরটা কাঁধে ফেলে জনার্দন বেড়িয়ে পড়ল।

সুভদ্রা ওর পিছু পিছু চলল। বেহুলা নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে একটা গাছ তলায় গিয়ে বসল তারা।

সুভদ্রা ভাবতে লাগল, এ আবার কি! ঘরের মেয়েকে বাইরে টেনে এনে চুপি চুপি গল্প করা কি ভাল? কিন্তু বেশ লাগছে। ঘর থেকে বেরিয়েই গা ছম ছম করছিল। মনে হচ্ছিল, গাঁ শুদ্ধ লোক বুঝি প্যাঁট্ প্যাঁট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখগুলো যেন গায়ে এসে ফুটছে। এখন আর সে ভয় নেই। কারণ এদিক পানে বড় একটা কেউ আসে না।

জনার্দনের পাশেই বসল সুভদ্রা। পশ্চিম আকাশ রাঙা হয়ে উঠছে। তাই দেখে সুভদ্রা বলল—দেখ, সূর্য কেমন পাটে বসেছে। একটু একটু করে এরপর একেবারে ডুবে যাবে। তারপর সিঁদুর রঙ কালো হবে, বহু দূর থেকে পাখীরা উড়ে আসবে। কি সুন্দর লাগছে! আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে কিন্তু।

—আমারও বেশ লাগছে। প্রথম প্রথম যখন দিদিমণির সঙ্গে বেড়াতে যেতুম, আমারও তোর মত আনন্দ হতো।

—সে আবার কি! তোমার আবার এই রকম হতে যাবে কেন। তোমরা তো ব্যাটাছেলে, বাইরেই তোমাদের দিন কাটে। আমরা হলুম ঘরের গরু। বাইরে বেরুলেই জ্ঞান থাকে না।

হঠাৎ জনার্দন ওর হাতটা টেনে নিল নিজের কোলে। তারপর

ওর আঙুলগুলোতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—তোর আঙুলগুলো কিন্তু ভারী সুন্দর। এমন সুন্দর আঙুল খালি রাখতে নেই। বলেই নিজের হাতের আঙটিটা ওর আঙুলে পরিয়ে দিল।

—একি! এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে? সুভদ্রা ভয় পেয়ে গেল।

—তা বলব কেন?

—বুঝতে পেরেছি, পিসীর বাক্স থেকে নিয়েছ?

—আঙটিটা আমার মায়ের। সেই জন্যেই তোর হাতে পরিয়ে দিলুম। আমার মায়ের যা গয়না আছে, সে সব তো একদিন তোরই হবে।

—চলো, এবার উঠে পড়ি! বাড়ী ফেরবার জন্যে সুভদ্রা যেন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জনার্দন ওর হাত চেপে ধরল, যাতে সে উঠতে না পারে। সুভদ্রা কিন্তু জোর করে উঠে পড়ল। ওর হাত না ছেড়ে জনার্দনও উঠে দাঁড়াল। বলল—তবে চল।

—যখন তখন মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দাও কেন? লজ্জা করে না?

—গায়ে হাত দেওয়া বুঝি তুই পছন্দ করিস না?

—না! আমি কেন, কোন মেয়েই পছন্দ করে না।

—কিন্তু দিদিমণি তো কিছু মনে করতো না! দিদিমণি তো আমার হাতটা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে কি সব দেখতো।

—তোমার দিদিমণির কথা বাদ দাও দিকি! ও-সব ভদ্দর লোকেদের লেখাপড়া জানা মেয়ে। ওরা অনেক কিছুই করে। তাই বলে আমাদেরও তাই করতে হবে নাকি?

—চলতে তোর কষ্ট হচ্ছে, সুভু?

—না! পা চালাও দিকি! সন্ধ্যে উতরে গেল যে!

—গেলোই বা! অন্ধকারে যেতে বুঝি তোর ভয় করে?

—হ্যাঁ!

—কিসের ভয়? বাঘ-ভাল্লুকের, না ভূত-পেত্নীর?

—বাঘ ভাল্লুক আবার এখানে কোথায়? তাছাড়া ভূত পেত্নীও কি সন্ধ্যেবেলায় বেরোয় নাকি? ভয়টা মানুষকে। আমার এক মামীর মুখে শুনেছি, অন্ধকারে অচেনা পুরুষের সঙ্গে যেতে নেই। ওদের তখন ভূতে পায়। ওরা তখন আর মানুষ থাকে না।

—আমি তো আর অচেনা মানুষ নই! তবে আমাকে তোর ভয় কিসের?

—তোমাকে আবার ভয় কি! তোমাকে যদি ভয় করতুম, তা হলে কি তোমার সঙ্গে বেরুতাম।

—তাহলে তুই আমাকে একটুও ভয় করিস না?

—ভয় না পেলে আমি কি করবো।

—যাতে ভয় হয়, তাই করব এবার।

একটু পরেই বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছল তারা।

বাড়ী গিয়েই কাপাড় জামা ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে পাটের শাড়ী পরে সন্ধ্যে দিল সুভদ্রা। তারপর যখন শাঁখ বাজিয়ে জনার্দনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন মনে পড়ল, গায়ে তার জামা নেই। খালি গায়ে থাকা যে অভ্যেস নেই, তা নয়। তবে এই মুহূর্তে এই অবস্থায় জনার্দনের সামনে বেরুতে তার ভারী লজ্জা করল। তাই উঠোন দিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলো। কিছুক্ষণ পরে কাপড় জামা প'রে দরজার কাছে গিয়ে জনার্দনকে ডাকল—একটু এদিকে এসে দাঁড়াও, আমি এক ছুটে বাড়ী চলে যাই।

সুভদ্রার সঙ্গে যেতে যেতে জনার্দন জিজ্ঞেস করল—রাত্তিরে মায়ের সঙ্গে আবার আসবি তো?

সুভদ্রা কিছু বলল না।

জনার্দন ওদের বাড়ীর দরজা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জনার্দনের দিকে চেয়ে একটু একটু করে দরজা বন্ধ করে দিল সুভদ্রা। জনার্দন দেখল ওর হাসিমাখা মুখটা ক্রমশঃ মিলেয়ে গেল।

রাত্রে পিসীর সঙ্গে সুভদ্রা যখন এল, জানার্দন তখন বাবার কাছে বসে ছিল। সন্ধ্যে থেকেই যুধিষ্ঠির খুব ছট্‌ফট্‌ করছিল। বার বার সকলকে ডাকছিল। কিন্তু কাউকে কিছু বলছিল না।

রাত্রে ওরা আসতেই, যুধিষ্ঠির পিসীকে ডেকে পাশে বসতে বলল। সুভুও একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসল।

পিসীর হাত ধরে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—জনার্দনকে তুই একটু দেখিস, ভাই। ওকে দেখবার আর কেউ রইল না। জমি-জমার কথা সবই তাকে বলেছি।

জনার্দন মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, বাবা। নইলে বুকের বেদনাটা আবার বাড়বে।

যুধিষ্ঠির বলল—ঘুম! এ-পোড়া চোখে যে ঘুম আসে না। শেষ ঘুম ঘুমোবার সময় হয়েছে কি না!

সুভুর মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। সুভুও কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জনার্দন বাবার রোগ-মলিন মুখের দিকে চেয়ে ধীর স্থির ভাবে বসে রইল।

## ॥ নয় ॥

অধ্যাপক হিমাংশু ব্যানার্জির বয়স এখনও তিরিশ পেরোয় নি। ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেও ইংরেজী ও বাঙলা সাহিত্য তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা আছে। সব সময়ই লেখা পড়া নিয়েই থাকেন। সংসারের ঝামেলা নেই বললেই হয়। সংসারে মা আর দাদা ও বৌদি ছাড়া কেউ নেই। সকলেই তাঁকে নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় রেখেছে।

হিমাংশুর ইচ্ছে ছিল না যে, প্রাইভেট ট্যুশনির ফাঁস গলায় পরে। কিন্তু দু'টি তরুণীর সনির্বন্ধ অনুরোধের কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার স্বীকার করতে হল। অর্থাৎ তাঁর এতদিনের ইচ্ছেটাকে বদলাতে হল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, কেতকীদের বাড়ীতে তিনি সপ্তাহে তিনদিন যাবেন, রাত আটটার পর। আরতি যদি পড়ে তাহলে তাকেও সেইখানে যেতে হবে।

হিমাংশুবাবুর কথায় কেতকী ও আরতী রাজী হয়ে গেল।

সেই থেকে হিমাংশু বাবু নিয়মিত পড়াতে যান কিন্তু তাঁর সঙ্গে আরতি যত সহজ ভাবে কথা বলে, কেতকী চেষ্টা করেও তত সহজ হতে পারে না। আরতির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হিমাংশুবাবু বার বার কেতকীর দিয়ে চেয়ে বলেন—Do you understand?

কেতকী মাথা নীচু করে। তখন আরতি মাথা নেড়ে জানায় যে, তারা দু'জনেই বুঝতে পেরেছে।

ধনবিজ্ঞানের দুরূহ সূত্রগুলি ওদের কাছে যত সহজ হয়ে ওঠে হিমাংশু ততই উৎসাহ পান। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তবু উঠতে পারেন না।

হিমাংশু চলে যাবার পর ওরা দুজনেই হিমাংশু সম্বন্ধে আশ্চর্য

ভাবে নীরব থাকে, কিন্তু তারপরও ওরা দুজনে অনেকক্ষণ পড়াশোনা করে। যা পড়ানো হল তাই নিয়েই আলোচনা করে। পরের দিন কি কি জিজ্ঞেস করতে হবে তাই শুধু ঠিক করে রাখে।

কিছুদিন যেতেই হিমাংশু বুঝল যে, সপ্তাহে অন্ততঃ তিনটে দিন তাঁর বেশ আনন্দে কাটে। শুকনো পড়াশোনা, কিংবা গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় যে সময়টা ভারী হয়ে উঠতো, সেই সময়টা যেন কেমন সহজভাবে কাটতে লাগল। এই সব ভাবতে ভাবতে কোনও কোনও দিন হিমাংশু অবাক হয়ে যান। অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্য মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেও, তিনি সফল হতে পারেন না। মনে হয় মুখময় বুঝি শুধু আবীরই ছড়ানো হল।

সেদিন হিমাংশুর আসবার দিন নয়। কেতকী একা একা পড়ছিল। রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা হবে। অনেকক্ষণ পড়ার পর কেমন যেন ক্লান্তি আসছিল। পড়তে আর ভাল লাগছিল না। একটু বেড়িয়ে আসবার কথা ভাবছিল।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই উঠে পড়ল কেতকী। মুখহাত ধোবার জন্যে চলে গেল বাথরুমে।

ঠিক সেই সময় হিমাংশুবাবু আরতিকে সঙ্গে নিয়ে কেতকীর ঘরে ঢুকল।

ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা খোলা। টেবিলে একরাশ বই খাতা। দুটো বই পাশাপাশি খোলা রয়েছে। 'পেনেরও' মুখটা আঁটা নেই। আরতি আর হিমাংশু দুজনেই বুঝতে পারল যে, কেতকী কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও পড়ছিল। এই মাত্র হয় তো কোথায় গেছে।

অভ্যাস বসেই একখানা খাতা টেনে নিলেন অধ্যাপক। এ পাতা সে-পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলেন। হাতের লেখাটি

তো বেশ ঝর ঝরে, কিন্তু মেয়েটি নিজে ভারী জটিল। হিমাংশু মনে মনে ভাবলেন কথাগুলো। হিমাংশু হয় তো আশা করেছিলেন খাতার কোনও একটা পাতায় এমন কিছু আবিষ্কার করবেন, যা দেখে অন্ততঃ মেয়েটাকে চেনা যাবে। কিন্তু না, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

খালিগায়ে ভিজে শাড়ীটাকে এদিক-ওদিকে জড়িয়ে 'বাথরুম' থেকে বেরিয়ে এল কেতকী। ঘরের কাছে এসেই চমকে গেল। এত রাত্তিরে কোত্থেকে এলেন প্রোফেসর! সঙ্গে আরতিও রয়েছে। চাপা গলায় আরতিকে ডাকল কেতকী—শোন, ভাই!

ঠোঁটে তর্জনী চেপে ধরল আরতি—স্ স্ স্! দাঁড়া ওখানে আমি শায়া জামা সব নিয়ে যাচ্ছি!

কেতকীকে সঙ্গে নিয়ে আরতি যখন ঘরে ঢুকলো, হিমাংশু তখন বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছেন। ওরা দু'জনেই এসে বসল।

বই থেকে মুখ তুলে কেতকীর দিকে তাকালেন অধ্যাপক। বললেন—এতক্ষণ নিশ্চয়ই পড়ছিলেন?

কেতকী ছোট্ট উত্তর দিল—হ্যাঁ। আপনারা এত রাত্তিরে?

হিমাংশু উত্তর দিলেন না, দিল আরতি। বলল—আজ দুপুর থেকেই কিছু ভাল লাগছিল না। ইভনিং শোয়ে সিনেমায় গিয়েছিলাম। সিনেমা থেকে বেরুবার সময় মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখে উনি তো অবাক। বললেন, আপনি সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছেন আর আপনার বন্ধু কি করছে? বললাম, মন দিয়ে পড়াশোনা করছে, বিশ্বাস না হয় দেখবেন চলুন!

বাধা দিয়ে হিমাংশুবাবু বললেন—এতে হয়তো আপনার অসুবিধা হল।

কেতকী বলতে পারতো, না এতে আর অসুবিধে কি। এসে

বরং ভালই করেছেন। আমিও ভাবছিলাম একটু বেড়িয়ে আসবো। কিন্তু কিছু বলল না। চুপ করে ওদের দুজনকে শুধু দেখতে লাগল।

আরতি ইচ্ছে করেই হিমাংশুকে মাষ্টার মশাই বলে ডাকে। কলেজে যিনি স্যার, বাড়ীতে তিনিই মাষ্টার মশাই। আরতি বলে, ইংরেজী 'স্যারের' চেয়ে মাষ্টার মশায় অনেক আপনার।

সাজগোজে আরতি চিরদিনই আলট্রা মডার্ণ। কিন্তু আজ যেন ভারী চোখে ঠেকছে। কেতকীর মনে হল প্রোফেসর ব্যানার্জির এবার পতন হবে। মূল্যবান একটি জীবন এবার পুড়ে ছাই হবে। আরতির জন্যে কিন্তু একটুও দুঃখ হল না। প্রোফেসর নষ্ট হয়ে যাবেন, এই ভাবনাতেই সে অস্থির হয়ে উঠল।

হিমাংশুবাবু হঠাৎ কেতকীকে প্রশ্ন করলেন—আপনি কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি?

—এতরাত্রে আর কোথায় বেরুবো।

আরতি ওকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করে বলল—চল্ না, মাষ্টার মশাইকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে আসি।

কিন্তু প্রোফেসর উল্টো কথা বললেন—না, না! আপনাকে আর বেরুতে হবে না! অনেকক্ষণ ধরে পড়ছেন এবার বরং 'রেষ্ট' নিন্, আমি একলাই চলে যাবো! আপনাকেও আর কষ্ট করতে হবে না মিস্ সান্যাল।

খেয়ে দেয়ে কেতকী শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ওদের কথা। সারারাত ভাল ঘুম হল না। হিমাংশুর সঙ্গে অত রাত্রে আরতি কোথায় গিয়েছিল? সিনেমার ব্যাপারটা কেতকী বিশ্বাস করে নি। অথচ আরতির প্রতি এতখানি অবিশ্বাস তার বোধহয় সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল না। হিমাংশুর সঙ্গে মেলামেশা করে আরতি যদি আনন্দ পায়, পাক্ না! কিন্তু কেতকীর সঙ্গে দেখা করতে

আসা কেন? কেতকী নিজে পড়েই পাশ করতে পারবে। হিমাংশুর সাহায্যের আর কোনও প্রয়োজন নেই।

কেতকীর ইচ্ছে হচ্ছিল, এখুনি উঠে গিয়ে মাকে ডেকে তুলে এই সব কথা বলে দেয়। উঠেও পড়েছিল, কিন্তু আবার কি মনে করে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতে কিন্তু বেশী বেলা হয় নি। বাবা-মা তখনও চায়ের টেবিলে আসেন নি। অনিরুদ্ধ বোধহয় চলে গেছে ময়দানে। তার প্রিয় খেলোয়াড়দের অনুশীলন দেখতে। ঠাকুরকে চা দিতে বলে কাগজটা নিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসল কেতকী। কিন্তু মনটা তখনও অস্থির হয়ে আছে। সে কি আরতিকে ঈর্ষ্যা করে? আরতি যদি হিমাংশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিংবা হিমাংশু আরতিকে ভালবাসে, তাতে কেতকীর কি এসে যায়। রাত্রে যদি ওরা ঘুরেই বেড়ায় তাতে কেতকীর মন ভারাক্রান্ত হয় কেন? আরতি চিরকালই তো ঐ ভাবেই সাজ-গোজ করে। তা হলে কালকের আরতিকে অত কুতসিৎ লাগছিল কেন? কেতকী বুঝতে পারল, হিমাংশুর সঙ্গে আরতির যে সম্বন্ধটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে সেইটাই সে সহ্য করতে পারছে না। অর্থাৎ হিমাংশুর প্রতি কেতকী নিজেও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। হিমাংশুকে সে একলা পেতে চায়। অত্যন্ত নগ্ন ভাবেই সত্যটাকে আবিষ্কার করল কেতকী। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে চাইছিল, কিন্তু মা-বাবা দু'জনেই এসে পড়লেন।

ঠাকুর চা দিয়ে গেল। তামসী অনেকক্ষণ ধরে কেতকীকে লক্ষ্য করে বললেন—কিরে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? কাল দেখলাম, অনেক রাত্রে প্রোফেসর এলেন, সঙ্গে বোধহয় আরতিও ছিল। কি ব্যাপার বল তো? কাল তো ওঁর আসবার কথা নয়।

—এমনি বেড়াতে এসেছিলেন। ছাত্রী কেমন পড়াশোনা করছে দেখে গেলেন।

—দেখে খুশী হয়েছেন তো ?

—তা জানি না। তবে আমি ভাবছি এবার থেকে একলাই পড়বো। ইকনমিক্স আমার তৈরী হয়ে গেছে।

—একলা মানে আরতিকে আসতে বারণ করে দিবি !

—আরতিকে নয়, প্রোফেসরকে !

—সে কি ! আমরা তো অন্য কথা ভাবছিলাম। কাল রাত্রে আমাদের এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আরতি আসাতে তোমার যে অসুবিধে হয় তা আমরা বুঝতে পারি। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম, আরতি যাতে আর না আসে তার ব্যবস্থা করবো। একলা থাকলে আরও বেশী তুমি জেনে নিতে পারতে।

মায়ের মতটা বাবারও মত মনে করে কেতকী তামসীর প্রস্তাবে রাজী হল। অর্থাৎ এ-বাড়ীতে আরতির পড়তে আসা বন্ধ হল।

অমিয়রঞ্জন ভাবছিলেন তামসী কেমন সুন্দর বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারে। হয় তো এইটাই মেয়েদের স্বভাব। মুখের কথায় ভেতরের ইচ্ছাটাকে ওরা কত সহজে গোপন রাখতে পারে। এই প্রসঙ্গ নিয়ে গত রাত্রে তামসীর সঙ্গে তাঁর যে সব আলোচনা হয়েছিল, সেগুলো নিশ্চয়ই এখনও তাঁর মনে আছে। তিনি শুধু বলেছিলেন—তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল প্রোফেসর জামাই করা, কিন্তু তাঁর সেই সাধ পূরণ হয় নি। এখন তুমি কি তাঁর সেই সাধ পূর্ণ করতে চাও।

—সে কথা থাক্, তুমি যখন বুঝতেই পেরেছ তখন আসল কথা বলি। হিমাংশু ছেলেটিকে আমি দেখেছি, আমার পছন্দ হয়েছে। এখন তোমার মত কি বল ?

—ভাল ছেলে অপছন্দের কি আছে, কিন্তু আমাদের মতামতটা কত কাজের হবে ভেবে দেখেছ !

—ভাববার কিছু নেই। আমাদের মতটাই যাতে কেতকীর মত হয়ে ওঠে এখন শুধু সেই চেষ্টাই করতে হবে। সেই জন্যেই আরতিকে আমি এখানে এসে পড়তে বলেছি, আর আজরাত্রে যে ওরা এল, এর পেছনেও আমার আদেশ ছিল।

—সে কি গো! তুমি যে 'শার্লক হোমস্'-এর মত কথা বলছ। কি ব্যাপার বল তো?

—সব কথা বলা যাবে না। তবে এটুকু জেনে রেখো যে, কেতকীর মন আমি যতটা বুঝি, তার সিকির সিকিও তুমি বুঝতে পার না।

—তা আমি একশবার স্বীকার করছি। কিন্তু এসব ব্যাপারে আরতিকে টেনে আনা হল কেন সেইটা কিছুতেই মাথায় আসছে না।

—সাধে কি বাবা বলতেন, ভাল ভাল ছেলেরা অফিসর হলে, ক্রমশঃ তাদের মাথায় গোবর জমতে থাকে।

অমিয়রঞ্জন বুঝতে পারলেন, এরপর আর মুখ খুলবে না তামসী। যেটুকু বলবার সে নিজে থেকেই বলে। জোর করে আদায় করা যায় না কিছু। তাই একটা চুরুট ধরিয়ে চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে জানালার দিকে মুখ করে বসলেন। রাত্রের আকাশ যেন বিরাট এক অরণ্য। অজস্র জোনাকীতে ছেয়ে আছে। অমিয়রঞ্জনের মনে হল, তামসী চায় হিমাংশুর প্রতি কেতকী আকৃষ্ট হোক। আরতি শুধু প্রতিযোগী হয়ে থাকবে, অভিনয় করবে, যাতে কেতকীর আকর্ষণ আরও তীব্র হয়। কিন্তু একি কুৎসিৎ পথ বেছে নিয়েছে তামসী। মেয়ের কাছে ওযে কত ছোট হয়ে যাবে সে খেয়াল ওর নেই। তাছাড়া এতে উল্টো ফলও তো ফলতে পারে!

—বাইরে চেয়ে চেয়ে কি আকাশ পাতাল ভাবছ? তোমার যদি অমত থাকে তো স্পষ্ট বল। অমন করে গুম হয়ে থেকো না।

—আমি ভাবছি অন্য কথা! তুমি যে রাস্তা দিয়ে এগোতে চাইছ, সে রাস্তাটাই খারাপ, নোঙরা। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত তোমার হিমাংশু যদি মনে মনে আরতিকেই ভালবেসে ফেলে!

—সে চিন্তাও করেছি। আশংকার কারণও দেখা দিয়েছে। এত রাত্রে মেয়েটা হিমাংশুকে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এল। আমি অবশ্য বলেছিলাম, ওকে সঙ্গে করে একদিন আসবি। কিন্তু তাই বলে এতরাত্রে।

—ছেলে মেয়েদের দেহ মন সুস্থ রাখাই বাপ-মায়ের কাজ। কিন্তু তার জন্য এই জঘন্য ষড়যন্ত্র কেন? মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। নিজের ভাল মন্দ বোঝবার ভার ওর উপর ছেড়ে দিলেই তো হয়।

—না, তা হয় না। ওর সঙ্গে আমাদের ভালমন্দকে আলাদা করা যায় না বলেই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

—এর নাম কি সাবধান হওয়া। নিজের মেয়েকে একটি পুরুষের সান্নিধ্যে আনবার জন্যে তোমার এই চেষ্টাকে আমি সুস্থ বলে মনে করতে পারছি না। সুতরাং এর ফলও যে খুব স্বাভাবিক হবে, তা আমার মনে হয় না।

—হিমাংশু ছেলে ভাল, যদি যোগাযোগ হয়ে যায়। মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়েরা ওর কম চেষ্টা করেই থাকে, সে চেষ্টাকে কেউ অসুস্থও বলে না, কুৎসিতও বলে না। সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান তোমার অল্প তাই ঐসব আজেবাজে কথা বলছ।

—বেশ তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

—ধোয়ার আড়ালে লুকোলে চলবে না। আমি যা জানতে চাই তা স্পষ্ট করে বল। কেতকী আমার একার মেয়ে নয়। তার ভবিষ্যৎ ভাবনা তোমাকেও ভাবতে হবে।

—কেতকীকে তুমি যত অবিশ্বাস কর আমি তত করি না। তার ভবিষ্যৎ সে নিজেই গড়ে নিতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে। সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের উপদেশ কিংবা পরামর্শ না চায়, তা হলে আমাদের বলার কিছু থাকতে পারে না।

অমিয়রঞ্জন উঠে পড়লেন। অত্যন্ত ধীরভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দরজা পেরোবার আগেই তামসী গর্জে উঠলেন—তোমার বিশ্বাসে তুমি অবিচল থাকতে পার, কিন্তু দয়া করে আমার কাজে বাধা দিতে এসো না।

অমিয়রঞ্জন হাত তুলে ওকে আশ্বাস দিলেন—আচ্ছা তাই হবে।

হিমাংশু একা এসে কেতকীকে পড়িয়ে যেতে লাগলেন। পড়া শেষ হবার কিছু আগে তামসী গিয়ে বসতেন ওদের পাশে। এ-কথা, সে-কথায় অনেকক্ষণ আটকে রাখতেন হিমাংশুকে। মায়ের এই ব্যবহারে কেতকী ক্ষুব্ধ হতো। কিন্তু কিছুই বলতে পারতো না।

একদিন ভারি অসহ্য ঠেকল। অধ্যাপকের সময়ের মূল্য অনেক। শুধু শুধু কতকগুলো সাংসারিক কথাবার্তায় তাঁকে আটকে রাখা ভারী অন্যায়। বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করল কেতকী।

অমিয়রঞ্জন প্রসঙ্গক্রমে কেতকীকে জিজ্ঞেস করলেন—হিমাংশুকে তোর কেমন লাগে।

বাবা জিজ্ঞেস করেছে বলেই হয়তো কেতকী অত সহজ ভাবে বলল—খুব ভাল। আজকাল অমন মানুষ দেখা যায় না।

অমিয়বাবু মনে মনে খুশী হয়েছিলেন। তামসীর বুদ্ধিকে প্রশংসা না জানিয়ে পারেন নি।

কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁদের ভুল ভাঙল। ওরা বুঝতে পারলেন যে, কেতকী এতদিন হিমাংশুকে শুধু শিক্ষক হিসেবেই শ্রদ্ধা করে

এসেছে। অন্য কোনও দুর্বলতা তাকে আশ্রয় করে নি। অর্থাৎ তামসীর এতদিনের চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়েছে।

পরীক্ষার খবর বেরুবার পর হিমাংশুকে একদিন নিমন্ত্রন করা হয়েছিল। বাইরের ঘরে বসে বসে তারা দুজন গল্প করছিল। কথায় কথায় কেতকী হঠাৎ বলল—মায়ের গোপন ইচ্ছেটাকে আমারও ইচ্ছে বলে যেন ভুল করবেন না।

হিমাংশু অবাক হবার চেষ্টা করে বলল—ভুল করব কেন?

কেতকী আরও স্পষ্ট হল—বোকা সাজবার চেষ্টা করছেন কেন? আপনি কি এতদিনেও বুঝতে পারে নি যে, মা চান আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে।

কেতকীর চোখে চোখ পড়তেই হিমাংশু বললেন—আপনি হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন, বুঝলাম না। আপনি কি ভেবেছিলেন এ বিষয়ে আমার খুব আগ্রহ আছে।

—না, তা আমি ভাবি নি। তবে পাছে ভুল বোঝাবুঝির জন্যে—

হিমাংশু বাধা দিয়ে বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমাদের বন্ধুত্বটা কোনও দিনই নষ্ট হবে না।

বন্ধুত্বটা অবশ্য শিক্ষা-শিক্ষণের গণ্ডী পেরিয়ে এগোবার চেষ্টা করবে না, কেতকী মনে মনে ভাবল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হিমাংশুকে সঙ্গে নিয়ে খাবার টেবিলে এল। সেখানে মা-বাবা দুজনেই বসে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হিমাংশুকে বসিয়ে দিয়ে কেতকী যেন বাঁচল। মনে হল এতক্ষণ ধরে যেন শরীরের ওপর দিয়ে ঝড় বইছিল। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে কাপড় জামা বদলে অল্প-প্রসাধন সেরে আবার সে খাবার ঘরে এল।

কেতকীকে দেখে তামসী খুশী হলেন। কিন্তু হিমাংশু

মুখটাকে খুব গম্ভীর করে মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন। মুখ তুলে কেতকীর দিকে একবার তাকাতেও পারলেন না।

একটা অনুতপ্ত পরিবেশের মধ্যে হিমাংশু সেদিন কোনক্রমে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলে গেলেন।

তামসী যখন সবকথা শুনলেন তখন গুম হয়ে বসে রইলেন। বুঝতে পারলেন যে, তিনি হেরে গেছেন।

হিমাংশু চলে যাবার পর আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অমিয়রঞ্জন তামসীকে কাছে ডাকলেন। ডেকে বললেন—বিরাট দুর্ঘটনা বা দুর্যোগ যেখানে উপস্থিত হয়েছিল সেখানে সামান্য ক্ষতিকে ক্ষতি বলে না মনে করে, সৌভাগ্য বলেই মেনে নেওয়া উচিত। সুতরাং ভাবনার কিছু নেই। হিমাংশুর কাছ থেকে আমরা যা আশা করেছিলাম তা পাই নি, কেননা সে-আশা করার অধিকারই আমাদের ছিল না। এখন কেতকী নিজেকে বুঝুক। সে-সময় তাকে তুমি দাও। তাতে সবদিক দিয়েই মঙ্গল হবে। তোমারও আর কোনও ভাবনা থাকবে না।

তামসী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—বেশ তাই হবে। তোমার মেয়ে তুমি তার ভালমন্দ বুঝবে। আমার কি দরকার এত মাথা ঘামাবার।

ওদিকে এক তীব্র অন্তর্জ্বালায় কেতকীও অস্থির হয়ে উঠেছিল। হিমাংশু কেন তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন? কেতকী কি এতই অযোগ্য? হিমাংশুর স্ত্রী হতে না পারার জন্যে এ-ক্ষোভ নয়। এ-ক্ষোভ হিমাংশু কেন তাকে অযোগ্য ভাবলেন। আরতির চেয়ে নিঃসন্দেহে সে যোগ্যতর। বরং হিমাংশু নিজেই কেতকীর যোগ্য নন। যাই হোক প্রোফেসরের সঙ্গে দেখা করে বলতে হবে, এত বিরূপ তিনি কেন হলেন?

## ॥ দশ ॥

যুধিষ্ঠির দাস মারা যাবার পর সমস্যাটা আরও কুতসিৎ আকার ধারণ করল। পাড়ায় আর মুখ দেখাবার উপায় রইল না। গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে কথাটা ফিরতে ফিরতে ভিন্ গাঁয়েও গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

সুভদ্রা আর এ-বাড়ীতে আসে না। তার মা-ও আসা কমিয়ে দিয়েছে। জনার্দন একাই থাকে। ঘরের কাজ, ক্ষেতখামারের কাজ সবই একা একা করতে হয়। দেহের সঙ্গে ক্রমশঃ মনটাও ক্লান্ত হয়ে আসে। ইচ্ছে করে না আর মাঠে মাঠে ঘুরতে। বাইরের দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বই পড়ে জনার্দন। কিষাণ-মজুর ডাকতে এলেও সাড়া দেয় না। মনে মনে ভাবে জায়গা জমি সব বেচে দিয়ে আবার সে চলে যাবে কলকাতায়। এই বিশ্রী গেঁয়ো জীবন আর ভাল লাগে না। জমি-জায়গা রাখার ঝঞ্ঝাট অনেক। কোর্টঘরও করতে হয়। গাঁয়ের লোকেদের মন বদলে গেছে। তাছাড়া জনার্দনকে সরল ভালোমানুষ পেয়ে কত লোক কত রকমে ঠকাবার চেষ্টা করে।

সুভদ্রার মত অমন সুন্দর মেয়ে, তার নামেও গাঁয়ের লোকে দুর্নাম রটিয়েছে। তারা বলে, অত বড় সোমথ মেয়ে রাত পর্যন্ত জনুর বাড়ীতে থাকে। অথচ বাড়ীতে আর কেউ নেই। দুজনের অত ভাবই বা কিসের। তাছাড়া গাঁয়ের মধ্যে বেহায়ার মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

জনার্দন অবশ্য ওদের কথায় কান দেয় না। গায়ে মাখে না

সেসব কথা। ভাবে পিসীকে একদিন ডেকে বলে দিলেই হবে যে, তোমার ভয় নেই পিসী। কালাশৌচ গেলেই ওকে আমি বিয়ে করবো।

সেই ভেবেই পিসীকে একদিন ডাকল জনার্দন। সব কথা বলল। শুনে পিসী গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর বলল—ততদিন এই কেলেঙ্কারীর কথা চেপে রাখা যাবে না। কালাশৌচ যেতে এখনও ছ'মাস বাকী।

জনার্দন চমকে উঠল। মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর কিছুই হয় নি, এমনি ভাব দেখিয়ে মুচকি হেসে বলল—ছ'মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে পিসী। ওর জন্যে তুমি ভেবো না।

—তুই আর ন্যাকা সাজিসনে জনু।

জনার্দন বুঝতে পারল যে, সুভদ্রার বাধা, সুভদ্রার আপত্তি, সত্ত্বেও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সেদিন তাকে যদি অমন ভাবে উন্মত্ত করে না তুলতো, তাহলে এ-বিপদে তাকে পড়তে হতো না। কিন্তু এখন উপায়?

সুভদ্রা যেদিন প্রথম বুঝতে পারল যে, সে সন্তান সম্ভবা, সেই দিনই সে তার মাকে বলেছে।

কালোমুখীর মুখ দেখাও পাপ!—বার বার একথা বললেও ভেতরে ভেতরে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছিল সুভদ্রার মা।

জনার্দনকে চুপ করে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে গেল সুভদ্রার মা। ডুবন্ত মানুষটা যাকে আশ্রয় করে হাত বাড়িয়েছিল, সেটাও একটা জলজন্তু, গভীর জলে তার বাস। তাহলে এখন কি হবে! সুভুর মা মুষড়ে পড়ল।

জনার্দন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এতখানি অন্যায় করার পরও সে কি করে এখানে নিশ্চিন্তে বসে আছে। পিসীও তো তাকে শাসন করছে না! যে-পিসীমা ছোটবেলায় একটু দোষ করলেই বকুনি

দিয়েছে, মারধোর করেছে, সে যেন অসহায়ের মত তার করুণা ভিক্ষা করছে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার কথাই তার মনে হচ্ছে না। অপরাধটাকে চাপা দেবার জন্যে সেও যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পিসী হয়তো ভেবেছে যে, দোষটা সুভদ্রার, জনার্দনের নয়।

জনার্দনের ইচ্ছে হল, এখনই সে চীৎকার করে বলে দেয় যে, সুভদ্রার কোনও দোষ নেই, দোষ আমার, আমাকে তুমি শাস্তি দাও। এমন নির্মম শাস্তি দাও যেন মানুষ শুনলে শিউরে ওঠে। তাহলেই মানুষ অমন জঘন্য কাজ করতে আর সাহসী হবে না।

জনার্দন চীৎকার করল না, কিন্তু সব কথা খুলে বলল পিসিকে।

সুভুর মা চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল—কে দোষী আর কে দোষী নয় এ-সব ভেবে এখন কোনও লাভ নেই। এখন বিপদ থেকে কি করে বাঁচা যায় তাই ভাবতে হবে। সেই জন্যেই আমি ছুড়তে পুড়তে এলাম। মেয়েটাকে ঘরে তালা দিয়ে এসেছি, বাইরে বেরুতে দিই না, লোকজন এলে জ্বর হয়েছে বলে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুইয়ে রাখি। কিন্তু এমনি করে আর কতদিন চালাবো? একটা কিছু বিহিত না করলে আমি আর মুখ দেখাতে পারি না। ওকে সঙ্গে করে কোথাও চলে গেলে ভাল হতো, কিন্তু কোন চুলোয় যাবো!

জনার্দন এবার মাথা নীচু করে বলল—আমাকে তুমি পাঁচদিন সময় দাও পিসী। আমিই সব ব্যবস্থা করছি। তোমাকে আর বেশী ভাবতে হবে না। তেমন বুঝলে, তোমাদের নিয়ে আমি কলকাতায় চলে যাবো। সেখানে কেউ কারোর খবর রাখে না।

সুভুর মা আশ্বস্ত হল, কিন্তু তবুও সেই বিষ-ভাবনাটাকে মন থেকে একেবারে তাড়াতে পারল না।

জনার্দন পিসীকে ভরসা দিল বটে, কিন্তু কি করবে, কি করলে সব দিক বজায় থাকে, কিছুতেই স্থির করতে পারল না। বসে বসে ভাবতে লাগল কি করা যায়। সন্ধ্যে হয়ে গেল, তবুও উঠল না। সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে বুঝে মাদুরের উপর শুয়ে পড়ল জনার্দন। হঠাৎ শাঁখ বাজার শব্দে জনার্দন চোখ খুলে দেখল তুলসীতলায় পিদ্দীম দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে সুভু চলে যাচ্ছে।

জনার্দন ডাকল—সুভু, এই সুভু!

সুভু দাঁড়ালো, কিন্তু আবার কি ভেবে, দু'পা এগিয়ে গেল। জনার্দন আর শুয়ে থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সুভুকে ধরে নিয়ে এল ঘরে। হ্যারিকেনটা জ্বেলে দিতে বলে বাইরের দোরে আগল দিয়ে এল। বলল—হ্যারে, এতদিন আসিস নি আজ যে বড় সন্ধ্যে দিতে এলি?

—আজ যে বিষ্যুৎবার।

—গেল বিষ্যুৎবার, তার আগের বিষ্যুৎবার তো আসিস নি!

—মা আসতে বারণ করেছিল। কিন্তু আজ আসতে বলল, তাই এলুম।

—ওঃ! নিজে থেকে আসিস নি! যাক, তুই আমার ওপর রাগ করেছিস?

—রাগ করবো কেন? তবে তোমার কাছে বেরুতে আমার ভারী লজ্জা করে। পায়ে পড়ি, আমায় যেতে দাও! দেরী হলে মা ভীষণ বকাবকি করবে।

জনার্দন আর কিছু বলল না। বুঝতে পারল যে সুভদ্রা অনেক বদলে গেছে। চার মাস আগের সুভদ্রাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর সুভুকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। দোর

দেবার আগে চুপি চুপি বলল—কাল দুপুরে একবার আসিস লক্ষ্মীটি, অনেক কথা আছে।

সুভদ্রা ফিরে তাকাল না, শুধু ঘাড় নেড়ে জানালো যে, সে আসবে।

কিন্তু তার পর দিন দুপুরে সুভদ্রা এল না। তখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে, সুভদ্রা পালিয়েছে। জনুর বাড়ী থেকে ফিরতে দেরী হয়েছিল বলে পিসী ওকে খুব বকেছিল। চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিয়েছিল। মেয়েটা সারারাত ধরে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল, তারপর কখন ঘরের শেকল খুলে কোথায় বেরিয়ে গেছে সুভুর মা তা জানতে পারে নি।

গাঁয়ের লোক সব জড়ো হয়েছে ওদের উঠোনে। নানা লোকে নানা কথা বলছে। গাঁয়ের লোকের কথা শুনে সুভুর মা স্থির থাকতে পারে নি। শেষে কাঁদতে কাঁদতে জনার্দনের কাছে এল। সঙ্গে এল পাড়ার মোড়লেরা। সুভদ্রার মামা মামী আরও অনেকে দল বেঁধে এল।

তাদের আসতে দেখে জনার্দন খুব ভয় পেয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে কত রকমের আশংকা মনটাকে অস্থির করে তুলল। তবুও সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার! কি হয়েছে পিসী? কাঁদছ কেন?

—তুই শুনিস নি! গাঁশুদ্ধ টি টি পড়ে গেল!

তারপরে একসঙ্গে শুরু হল চীৎকার, কোলাহল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে সংবাদটা জানাল জনার্দনকে। জনার্দন অবশ্য আগেই খবর পেয়েছিল। এবার সে পিসীকে বলল—তুমি এখানে থাকো, আমি থানায় যাচ্ছি। পালিয়ে যাবে কোথায়? আমি এক্ষুণি ওকে খুঁজে আনবো।

পাড়ার লোক নিরুৎসাহ হয়ে, কুতসিৎ মন্তব্য আর অশ্লীল ইঙ্গিত করে চলে গেল।

থানা কি এখানে, সেই বলাগড়ে। হাঁটতে হাঁটতেই চলে গেল জনার্দন। সাত মাইল রাস্তা কখন যে ফুরিয়ে গেল, তা খেয়ালই রইল না।

থানার বাবুরা সব লিখে নিয়ে বলল—আচ্ছা, আমরা খুঁজে দেখছি! তুমি বাড়ীতে থেকো, বিকেলের দিকে আমাদের লোক যাবে।

কিন্তু সবই বৃথা। সুভদ্রাকে কোথাও পাওয়া গেল না। আশপাশের গ্রামে লোক পাঠানো হল, পুকুরে জাল ফেলা হল, কিছুতেই কিছু হল না। তখন জনার্দন আবার সুভদ্রার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

একমাস ধরে পাগলের মত এখানে সেখানে ঘুরে জনার্দন যখন বাড়ী ফিরল তখন আর তাকে চেনাই যায় না। সুভদ্রার মা এসে বলল—তোকে আর কষ্ট করতে হবে না জনু, সে হতভাগী মরেছে। তুই আর ওর জন্যে মন খারাপ করিস না।

জনার্দন ভাবতে লাগল, মরবেই যদি তাইলে দেহটা যাবে কোথায়? এই গাঁ ছেড়ে সে তো কোনদিন একা একা কোথাও বেরোয় নি। নিশ্চয়ই কোন বদমায়েসের হাতে পরেছে। তারা গুম করে রেখেছে। কিংবা কলকাতায় নিয়ে গেছে। সেইজন্যেই কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সুভদ্রা দেখতে ভাল। রঙটা ফর্সা নয় বটে, কিন্তু গা-গতরে ছিরি আছে। কার নজরে পড়েছে কে-জানে।

## ॥ এগারো ॥

হিমাংশুবাবু কোনও কথাই গোপন করলেন না। আরতির কাছে যা যা শুনেছিলেন, সবই বললেন কেতকীকে।

কেতকী বুঝতে পারল যে, তার অনুমান সত্যি। হিমাংশুর কাছে আরতি কেতকীকে ছোট করবার চেষ্টা করেছে।

হিমাংশুর সব কথা শুনে কেতকী জিজ্ঞেস করল—ভৃত্যের সঙ্গে আমি যে-স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে তুলেছিলাম সেটাকে আপনি নিজে কিভাবে নিয়েছেন? লোকে অনেক কথা বলছে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব আমায় অনেক নিন্দাও করেছে, তবুও আমি জানতে চাই, আপনার মতে এ-আচরণ নিন্দনীয় কিনা?

হিমাংশু বুঝলেন যে, প্রশ্নটা কঠিন। অতএব উত্তরটা একটু ভেবেচিন্তে দিতে হবে। কেননা, যদি তিনি 'না' বলেন তাহলে কেতকীর আচরণকে তিনি অনুমোদন করেন, এটাই প্রমাণিত হবে। আর যদি 'হ্যাঁ' বলেন তাহলে কেতকীর কাছে তিনি ছোট হয়ে যাবেন। কেতকী ভাববে, আর পাঁচজন মানুষের মত হিমাংশুর মনও খুব সংকীর্ণ। এ-দুটো ধারণাকেই তিনি এড়িয়ে যেতে চান। তাই সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে হিমাংশু বললেন—এক পক্ষের মন্তব্য শুনে বিচার করা চলে না। আপনি যদি সত্যিই আমার মতামত চান, তাহলে আপনার কথাও আমাকে শুনতে হবে। কিন্তু এখন আমার সে-সময় নেই। আমাকে যে এখুনি বেরুতে হবে।

কেতকী যেন ওর কথা শুনতেই পায় নি, যেমন বসেছিল তেমনি বসে বসেই ভাবতে লাগল, "আরতির কাছ থেকে হিমাংশু

যা শুনেছে তাই বিশ্বাস করেছে এবং বিশ্বাস করেছে বলেই কেতকীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। কেতকী জানে, হিমাংশু তাকে ভালবাসতেন। পড়াতে পড়াতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকতেন কেতকীর দিকে আর সেই মুহূর্তে কেতকীর যদি সেই দিকে চোখ পড়তো, তাহলে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতো কেতকী। একটু হেসে হিমাংশুও মুখ নামিয়ে নিতেন।

কিন্তু আর পাঁচজন যা ভেবেছে, হিমাংশুও তাই ভাবলেন! কেতকীকে কেউ বুঝতে পারল না। ছকে ফেলে ওরা মানুষের মনকে বিচার করতে চায়। কার্য দেখে ওরা কারণের অনুসন্ধান করে। কারণ পেলেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম কি নেই? কেতকী তো জানে, জনার্দনকে সে শুধু মানুষ করতেই চেয়েছিল। আত্মীয়-বন্ধু বলে সমাজের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল। সে-বাসনার মধ্যে আর যাই থাক, দৈহিক দুর্বলতা কিছু ছিল না।

কেতকী আশা করেছিল, অন্ততঃ হিমাংশুবাবু তাকে বুঝতে পারবেন। কেতকীর ইচ্ছার আড়ালে বিকৃতির সন্ধান করবেন না। কিন্তু হিমাংশুও ওদের দলে চলে গেলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস যেন আর্তনাদ করতে করতে বেরিয়ে এল।

হিমাংশু উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার বসে পড়লেন। ওঁর মনে হল, কেতকী বোধ হয় আশ্বাস পেতে চায়, সান্ত্বনা পেতে চায়। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে হিমাংশু সচেতন হলেন। বললেন—দেখুন, মিস্ রায়, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ভারী বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আপনি দেখছি নিজের ওপরই আস্থা রাখতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত যদি সে-টুকুও খুইয়ে বসেন, তাহলে দাঁড়াবার মাটি পাবেন না।

কিন্তু তা না পেলেই আপনার হার হবে। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন, জানি না তাতে আপনার কি প্রয়োজন, তবুও বলছি—আপনার মনের গড়ন আর পাঁচজনের মত নয় বলে আপনাকে ওরা হয়তো ঠিক বুঝতে পারছে না। আমার ধারণা, যে তীব্র ইচ্ছা আপনাকে চালিত করেছিল, তার মধ্যে কোথাও কোনওখানে হয়তো স্বার্থের ছিদ্র ছিল, যার সন্ধান ওরা পেয়েছে। তাই ওরা অতখানি দুর্মুখ হয়ে উঠেছে। সুতরাং জনার্দনকে বিশেষ না করে নির্বিশেষ করুন, তাহলেই ওরা ওদের ভুল বুঝতে পারবে।

হঠাৎ যেন পাথরটা সরে গেল। কেতকী উচ্ছল হয়ে জিজ্ঞেস করল—আরও একটু পরিষ্কার করে বলুন স্যার, আমি বুঝতে পেরেছি, তবুও সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে চাই।

মুহূর্তের মধ্যেই আপনি যেন বদলে গেলেন!—মুচকি হেসে হিমাংশু বাবু আবার বলতে লাগলেন—ভেতরে রক্ত চলাচল বোধ হয় এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জমাট বাঁধা বরফের মত এতক্ষণ আপনি নিঃসাড় হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ এত উৎসাহ পেলেন কোথা থেকে? এ থেকেই আমি বুঝতে পারছি, আপনাকে ওরা ভুল বুঝেছে। আমিও হয়তো বুঝতাম, যদি আপনি আমার সঙ্গে দেখা না করতেন। যাক্ জনার্দন নামক একটি বিশেষ ছেলেকেই যদি আপনি মানুষ করে তুলতে চান, তাহলে সকলেই বুঝবে যে এর মধ্যে কোনও স্বার্থ আছে। কিন্তু যে-কোনও জনার্দন হলেই যদি আপনার কাজ চলে, তাহলে কারো মনে আর কোনও ক্ষোভ থাকবে না।

কেতকী এবার নিজের মনকে খুঁজতে লাগল। সত্যি যে-কোনও ছেলে হলে ঠিক অতখানি যত্ন নিয়ে, অতখানি উৎসাহ নিয়ে পড়ানো সম্ভব হতো কিনা! জনার্দন ছাড়া অন্য কোনও ছেলের কথা কেতকী ভাবতেই পারল না।

তবে কি একটি ব্যক্তির জন্যেই এই দুর্বলতা! তাহলে তো ওদের

সন্দেহ মিথ্যে নয়। হিমাংশুবাবু তো ঠিকই বলেছেন। নিজেকে ভারি দুর্বল ও অসহায় বলে মনে হল কেতকীর।

হিমাংশুবাবু বুঝতে পারলেন, কেতকী নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়ে গেছে। এটাই দরকার ছিল। তাই এসম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা না করে জিজ্ঞেস করলেন—এম. এ. পড়লেন না কেন?

—মিছিমিছি দুটো বছর নষ্ট করে লাভ কি?

—কিন্তু ছ'মাস তো কেটেই গেছে!

—হ্যাঁ! আর নয়। এবার আমাকে কাজে লাগতে হবে। দরকার হলে আপনাকেও আমার কাজে সাহায্য করতে হবে!

—কিন্তু কি কাজ তাতো জানতে পারলাম না।

—ঠিক সময়ই জানতে পারবেন। আপনিই হবেন আমার একাজের প্রথম উৎসাহদাতা। সুতরাং আপনাকে না জানিয়ে আমি কিছুই করব না। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম। বলতে বলতে কেতকী উঠে পড়ল। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলল।

কেতকী মুক্তি চায়। অসংখ্য কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন মুক্তি চায়। কেতকী ক্রমশঃ দৃঢ় হল। নতুন জীবনে তার শুভ উত্তরণকে সম্ভব করতে হবে। জীবনের বক্তব্যকে প্রকাশ করতে হবে কঠিন কর্মের শিলালিপিতে।

## ॥ বারো ॥

সুভদ্রা নিজেকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল। অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন আবদ্ধ থেকে বার বার তার মনে হতো, সকলের কাছ থেকে এই ভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেই কি সত্যকে লুকিয়ে রাখা যাবে। একদিন না একদিন ওরা সবাই জানতে পারবে। তখন সে দাঁড়াবে কোথায়? মুখ দেখাবে কি করে?

মরে যাওয়া তার চেয়ে অনেক সহজ। তিলে তিলে একটু একটু করে ম'রে যাওয়ার চেয়ে মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়া অনেক ভাল। কেউ জানবে না, কেউ কোনও খোঁজও পাবে না।

কমুদা হয়তো কাঁদবে। খুব কষ্টও হবে। বাড়ি ছেড়েই হয়তো পালিয়ে যাবে কোথাও। তারপর পাগলের মত এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবে। মাও হয়ত কেঁদে কেঁদে পাষাণ হয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে সুভদ্রার দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, তবুও সুভদ্রা ফিরল না।

শেষ রাত্রের অন্ধকারে বাড়ী ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল। রাস্তা দিয়ে গেলে পাছে কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাই মাঠের আল বেয়ে সে যাচ্ছিল রেল লাইনের দিকে।

ভোরের দিকে একটা গাড়ি যায়। গাড়িটা বাঁশী বাজিয়ে রোজই যেন ওকে ডাকত। আজ এতদিন পরে সেই ডাক শুনে সুভদ্রা বেরিয়ে পড়েছে।

অনেকখানি পথও পার হয়ে এসেছে। পূর্বদিক ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে। সুভদ্রার মনে হল গাড়িটা বোধহয় তখনই এসে পড়বে। উত্তেজনায় খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগল সুভদ্রা। কখনও আল বেয়ে, কখনও মাঠের মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে পড়ে গিয়েই সুভদ্রা জ্ঞান হারাল।

নির্জন মাঠের মধ্যে কতক্ষণ যে সে পড়েছিল তার খেয়াল নেই। জ্ঞান ফিরলে প্রথম সে বুঝতে পারল, রোদের তাপ বেড়েছে, জলতেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। শরীরে এতটুকু শক্তি নেই যে হেঁটে কোথাও যায়।

মাথার ওপর কাপড়টা তুলে দিয়ে সুভদ্রা ওইখানেই কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবতে লাগল, কেন সে এখানে এসেছে। তারপর একটু একটু করে যখন সব কথা মনে পড়ে গেল, তখন সুভদ্রা ভয়ে শিউরে উঠল। বেঁচে থাকবার জন্যে সমস্ত দেহ মন যেন তার আকুল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। খানিকটা এগিয়েও গেল। কিন্তু কোথায় যাবে ?

ভাবতে ভাবতে স্টেশনের দিকে না গিয়ে সুভদ্রা বাজারের দিকে এগোতে লাগল। খিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। আর বুঝি হাঁটতে পারবে না সুভদ্রা। তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তার কাছে তো একটাও পয়সা নেই। রেলে মাথা দেবার জন্যে সে বেরিয়েছিল, সঙ্গে পয়সা নেবে কেন! কথাগুলো মনে হতেই সুভদ্রা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। না, না! মরতে সে পারবে না। কিছুতেই না। তাকে বাঁচতেই হবে।

আর একটু দূরেই ষষ্ঠীতলার বাজার। সেখানে কত লোক, কত দোকান পাট রয়েছে, কারো কাছে কি ভিক্ষে পাওয়া যাবে না। কোনও ক্রমে কিছু খেয়ে নিয়ে, খেয়া পেরিয়ে সুভদ্রা শান্তিপুরে চলে যাবে, সেখানে তার মামীর বাপের বাড়ি।

কিন্তু কেউ যদি ভিক্ষে না দেয়। আসবার সময় কেবল জমুদার দেওয়া আঙটিটি সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু মরাই যখন হল না, তখন আঙটিটা বয়ে বেড়াবার দরকার কি ? বেচে ফেললে কোন দোষ হবে না। যার আঙটি তার সঙ্গে যখন আর দেখাই হবে না, তখন আর ভাবনা কিসের।

ষষ্ঠীতলার বাজার। দূরে ঠাকুরবাড়ির রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পাশাপাশি কত দোকান। কত লোক। যেন মেলা বসেছে! কাপড়টা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সুভদ্রা এগোতে লাগল।

কিন্তু কই! একটাও স্যাকরার দোকান তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছে না। যদি সন্দেহ করে। অথচ আঙটিটা না বেচলে সে খাবে কি?

ওপারে যাবেই বা কি করে। একটা গলির মধ্যে ঢুকলো সুভদ্রা। সামনেই মোটা মোটা গরাদ দেওয়া চওড়া জানালা। ভেতরে একটা মস্ত বড় প্রদীপ জ্বলছে। ঘাড় নীচু করে ঠুকঠুক করে কাজ করছেন এক বৃদ্ধ। একমনে কাজ করছেন, কোনও দিকে তাঁর নজর নেই। সুভদ্রা একবার ডাকল, কিন্তু তবুও উনি মাথা তুললেন না।

সুভদ্রার গলা পেয়ে ভেতর থেকে একজন ছুটে এল। এসে জিজ্ঞেস করল—বাবাকে ডাকছেন? উনি তো কানে ভাল শুনতে পান না। আপনার কি দরকার বলুন।

সুভদ্রা আর কথা বলতে পারল না। ঐ বুড়োর কাছে সব কথা বলা হয়তো সহজ ছিল, কিন্তু এর কাছে তা বলা চলে না।

সুভদ্রা ছেলেটিকে অপলক নয়নে দেখতে লাগল, মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল। চোখ দুটো বড় বড়, ভাসা ভাসা। খালি গা। সুপুরুষ বটে। সুভদ্রা চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—আপনি বসুন, আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।

লোকটি হয়তো ভাবল, বাবার সঙ্গেই মেয়েটার দরকার। তাই বাবার কাছে গিয়ে হাত মুখ নেড়ে, জোরে জোরে বললে আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছেন।

বৃদ্ধ হাত নেড়ে সুভদ্রাকে বসতে বললেন। সুভদ্রা বসল। বসে বসে দেখতে লাগল, ছোট একটা যন্ত্র দিয়ে কেমন সুন্দর একটা হার তৈরী করছেন। একটা মাকড়সার জাল। মাঝখানে একটা মস্ত বড় মাকড়সা বাঁকা বাঁকা তার আটটা পা বিস্তার করে বসে আছে। চোখ দুটো পর্যন্ত যেন জ্বলজ্বল করছে। ঐইটা বোধহয় লকেট হবে!

কথা না বলে দেখতে লাগল সুভদ্রা। কিন্তু এই ভাবে বসে থাকলে তো চলবে না। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। জলতেষ্টায় গলা কাঠ হয়ে গেছে।

এবার বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই তোমার?

সুভদ্রা হাত থেকে আঙটিটা খুলে, বৃদ্ধের হাতে দিল। তারপর বলল—এটার কত দাম হবে?

অনেকক্ষণ ধরে বৃদ্ধ আঙটিটা দেখলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছেলেকে ডাকলেন—ওরে, ও শঙ্কর, কোথায় গেলি? এদিকে একবার আয়।

সেই ছেলেটি আবার এল। এবার যেন কেমন একটা করুণ দৃষ্টি মেলে তাকাল সুভদ্রার দিকে। তাতে ফুটে উঠেছে তার সহানুভূতির স্পষ্ট আভাস।

সুভদ্রা ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে—দেখুন, আমি ওটা বিক্রী করবো না। ওটা রেখে যদি আমাকে কিছু টাকা দেন তো ভারি উপকার হয়। আপনার বাবাকে সেটা বুঝিয়ে বলুন।

সুভদ্রার কথার জবাব না দিয়ে শঙ্কর বাবার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাল।

বাবা বললেন—মেয়েটাকে ভেতরে নিয়ে যা। জলটল কিছু খেতে দে। তারপর ঘণ্টা খানেক পরে এখানে নিয়ে আসিস। সুভদ্রাকে বললেন—তুমি ভেতরে যাও তো মা!

যেন আদেশ। কিন্তু সুভদ্রার ভারী ভালো লাগল।

যেতে যেতে শঙ্কর জিজ্ঞেস করল আঙটি বাঁধা দিয়ে টাকা চাই-ছিলেন। সঙ্গে নিশ্চয়ই তাহলে টাকা কড়ি কিছু নেই। পরণের কাপড় জামা দেখে মনে হচ্ছে, যেমন ভাবে ঘরে ছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই বেরিয়ে এসেছেন। কি ব্যাপার বলুন তো? বাড়ীতে কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি? আপনার বাড়ি কতদূর?

শঙ্করের মুখের দিকে একবার তাকাল সুভদ্রা। কিন্তু ওর প্রশ্নের

কোনও জবাব দিল না। ঘরে ঢুকে একপাশে জড়োসড়ো হ'য়ে বসল।

একটি মেয়ে এসে ডিশে করে কিছু খাবার আর একগ্লাশ জল দিয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গেই এলেন শঙ্করের মা, আরও দুটো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। ওরা সবাই সুভদ্রাকে দেখতে লাগল।

খাবার দেখে সুভদ্রা বললে—এত খাবার আমি খেতে পারবো না। ওদের দুটো দিন!

মা বললেন—ঐ তো কটা জিনিস, খেয়ে নাও! লজ্জা করো না। শঙ্কর তুই যা তো এখান থেকে।

খাবারগুলো খেয়ে সুভদ্রা যেন বাঁচল। সে ভাবল, এরা এখানে তাকে আটকে রাখবে না কি?. কিন্তু আমাদের গাঁ তো এখান থেকে বেশী দূর নয়। কত লোক রোজই তো এই বাজারে আসে বেচা-কেনা করতে। যদি কেউ দেখতে পেয়ে মাকে খবর দেয়। এইসব ভেবে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সুভদ্রা।

সুভদ্রাকে উঠতে দেখে শঙ্কর এসে আবার ঘরে ঢুকলো। বলল—উঠলেন কেন? বাবা এখনই আসছেন! বসুন।

শঙ্করের মা চলে গেলেন, তখনও তাঁর অনেক কাজ বাকী। একটা টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে শঙ্কর সুভদ্রাকে বসতে বলল। নিজে বসল ধানের বস্তার ওপর।

চেয়ারে না বসে সুভদ্রা মেঝের ওপরই বসে পড়ল। শঙ্কর বলতে লাগল ওর বাবার কথা—শুধু গুপ্তিপাড়া কেন, মোহন স্যাকরার নাম শোনে নি আশ-পাশের চার-পাঁচটা গাঁয়ে এমন লোক একটাও নেই। তাই মোহন স্যাকরার দোকানে এখনও ভীড় জমে। এবার দোকানের নতুন নামকরণ হয়েছে। মস্ত বড় সাইন বোর্ড ঝুলছে—'অঙ্গাভরণ,' স্বত্বাধিকারী—মোহনলাল স্বর্ণকার।

আমি বড় ছেলে। স্কুলে পড়াশোনা করেছি। একটা পাশও করেছি। ইচ্ছে ছিল কলকাতায় গিয়ে চাকরী-বাকরী করি, কিন্তু বাবা যেতে দেন নি।

সেই থেকে বাবার কাছে বসে বসে হাতে নাতে অনেক কাজ শিখেছি, এখন আমিও ছোটখাট শিল্পী। আমারও খুব নামডাক হয়েছে। বড়বাজারে একটা দোকানও খুলেছি খাওয়া দাওয়া সেরে সেখানে গিয়েই আমাকে বসতে হয়।

সুভদ্রাও শুনেছে মোহনলালের নাম। মায়ের কাছ থেকেই শুনেছে যে, মায়ের সব গহনা নাকি মোহনলালই গড়ে দিয়েছিলেন। কাজে কর্মে তাদের গাঁয়ের সকলকেই আসতে হয় মোহনলালের কাছে। সুভদ্রা বাবার আদর কোনও দিনই পায় নি। শঙ্করের মুখে ওর বাবার কথা শুনে সেই কথাই বারবার মনে হচ্ছিল। জ্ঞান হওয়া থেকেই সে দেখে আসছে তার বিধবা মাকে। সে মামার বাড়ী থাকে। এ পর্যন্ত কোনও দিনই তার মনে হয় নি যে, বাবা থাকলে সে আরও সুখে থাকতে পারত। কিন্তু আজ এদের কথা শুনে, এদের আদর যত্নে তার মনটা পিতৃ-স্নেহের জন্য কাঙাল হয়ে উঠল। তার মনে হল এখানে যদি সে আশ্রয় পায় তা হলে আর কোনও দিনই কারো কাছে সে ফিরে যাবে না। এ শুধু আশ্রয় নয়। এ যেন তার স্বপ্ন

কিন্তু সব কথা শুনলে এঁরা কি তাকে ঠাঁই দেবে? হয়তো ঘর থেকে গলাধাক্কা দিয়েই বের করে দেবে।

কথাগুলো মনে হতেই ভয়ে শিউরে উঠল সুভদ্রা। হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে কান্না রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

দোকান থেকে বাবার ডাক শুনে শঙ্কর বেরিয়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহনলাল এসে ঘরে ঢুকলেন।

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি চোখমুখ মুছে নিয়ে একটু স'রে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসল।

মোহনলাল বললেন—কই তোমার আঙটিটা দেখাও তো মা?

সুভদ্রা ভাবতে লাগল, আঙটিটা হাত থেকে খুলবে কিনা। উনি কি সত্যিই আঙটিটা নিতে এসেছেন, না সুভদ্রা সম্বন্ধে সব কিছু

জানতে এসেছেন। সুভদ্রা চুপ করে বসে রইল। সেই সময় শঙ্করের মা এসে ঘরে ঢুকলেন।

তাঁকে দেখে একটু আশ্বস্ত হ'ল সুভদ্রা; মুখ তুলে তাকাতে পারল। শুধু তাই নয়, হাত থেকে আঙটিটাও খুলে তাঁর হাতে তুলে দিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, শঙ্করের মা সেটা মোহনলালের হাতে দিয়ে দিলেন।

মোহনলালও অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর কি যেন ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন যে, এ আঙটি তাঁরই তৈরী এবং বিশেষ পরিচিত।

মোহনলাল চলে যেতেই শঙ্করের মা সুভদ্রার পাশে এসে পা ছড়িয়ে বসলেন। বললেন—এতক্ষণে ফুরসৎ পেলুম মা, তাই বসতে পারলুম। তোমাকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। তোমার মত একটা লক্ষ্মী বৌ ঘরে আনতে পারলে আমার খাটুনি কমত। ভগবান কি আমার সে সাধ মেটাবেন।

সুভদ্রা বুঝতে পারল, এই মানুষটির কাছেই তার যেমন সবচেয়ে বেশী ভরসা, তেমনি আবার সবচেয়ে বেশী ভয়। মনে করলে, ইনি হয়তো সুভদ্রাকে বাঁচাতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে, ইনিই পারেন মেরে ফেলতে।

কিছুক্ষণ পর সুভদ্রা বললে—আমি আর এখানে বসে কি করবো, কর্তাতো আঙটিটা নিয়ে দোকানে গেলেন, আমিও সেখানে যাই।

—না, না! তুমি কেন সেখানে যাবে? উনি এখনই আবার আসবেন। তুমি বসো।

কিন্তু মোহনলাল এলেন না। এল শঙ্কর। সে মাকে বলল, আজ আমি আর দোকানে বেরুবো না। বাবা বারণ করলেন। আর বললেন, এ-বেলা ইনি এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। বাড়ী থেকে ইনি পালিয়ে এসেছেন। বিকালের দিকে খোঁজ খবর নিয়ে বাড়ীতে ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

সন্ধ্যে থেকে শঙ্কর অনেকবার এসেছে সুভদ্রার কাছে। অনেক সান্ত্বনা দিয়েছে। কিছু না বললেও শঙ্কর যেন ওর মনের দুঃখ বুঝতে পেরেছে। শঙ্করকে ভারী আপনার জন বলে মনে হয়েছে সুভদ্রার। তার কাছে সে স্বীকারও করেছে যে, সে সত্যি সত্যি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু কেন এসেছে, সে কথা বলে নি।

অনেক রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সুভদ্রা বিছানায় শুয়ে ছটপট করছিল। একবার মনে হল আজও সে আবার বেরিয়ে পড়বে। গঙ্গায় ডুবে মরলে কেউ কোন খবর পাবে না। তা না হলে কাল সকালেই শঙ্করের সঙ্গে তাকে গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু শঙ্করও কি তাই চায় যে সুভদ্রা বেঁচে থাকুক। শঙ্কর তো জানে না যে, তার বেঁচে থাকবার উপায় নেই। এইসব ভাবতে ভাবতে সুভদ্রা বাইরে এসে বসল।

ঠিক সেই সময় শঙ্করও চুপি চুপি এসে দাঁড়াল সুভদ্রার পেছনে। এবার পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে বলল—একি, আপনি এখানে বসে রয়েছেন কেন? ঘুমোন নি?

সুভদ্রা উত্তর দিতে পারল না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর যাবার জন্যে পা বাড়াতেই শঙ্কর ওর হাতটা চেপে ধরল। সুভদ্রা বাধা দিয়ে বলল—ছেড়ে দিন, লাগছে।

শঙ্কর ওকে একটু কাছে টেনে এনে বলল—তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রাখবো, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না। তোমাকে দেখা অবধি আমার মন বলছে তোমাকে পেলে আমি সুখী হব। তাছাড়া মা'ও তোমাকে এখানে থাকবার জন্য বলেছেন। তোমার ঐ সহজ ও সরল গ্রাম্য ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। একবার বল তুমি আমার কথা রাখবে।

—কিন্তু আমি যে তা পারি না। না, না, তা হয় না!

দেহের মধ্যে এক অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করল শঙ্কর। বুকের মধ্যে তার মুখটাকে চেপে ধরে বলল—একটু পরেই আমরা বেরিয়ে

পড়বো। বাবা জানবেন তোমাকে আমি গাঁয়ে পৌঁছে দিতে গেছি!

—কোথায় যাবেন আমাকে নিয়ে? বিপদ যে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে! আমার সব কথা শুনলে আপনিও ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নেবেন।

শঙ্কর ততক্ষণে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। বলল—কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি যদি আপত্তি না করো, কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। গঙ্গা পেরিয়ে আমরা শান্তিপুরে যাবো। সেখান থেকে রেলে চেপে রানাঘাট হয়ে সোজা শিয়ালদহ। সেখানে গিয়ে বাবাকে জানাব যে বিশেষ কারণে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি। সময় মত আপনাদের সাথে দেখা করব।

এতক্ষণে সুভদ্রাকে ছেড়ে দিল শঙ্কর। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সুভদ্রা একটু সরে গিয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল—তারপর কি করব?

—তারপর একটা কাজ যোগাড় করে নিয়ে সেইখানেই থাকবো আমরা। বাবাকে চিঠি দেবো। বাবা নিশ্চয়ই আমাদের বিয়ের স্বীকৃতি দেবেন। কারণ আমি কোন অন্যায় করি নি। একটি অনাথা বালিকার ভার গ্রহণ করেছি বলে তিনি খুসীই হবেন। আমি তাঁর মন জানি। তখন আবার আমরা বাড়ী চলে আসবো।

কিন্তু!—সুভদ্রা কিছুতেই রাজী হতে পারছে না!

—কিন্তু নয়, তোমাকে রাজী হতেই হবে।

—ঘর বাঁধবার স্বপ্ন সব মেয়েরই, থাকে কিন্তু ঘর ছেড়ে আমি পথে বেরিয়েছি! পথই আমার আশ্রয়। চলুন, পথে নেমেই আমার কথা শুনবেন।

—কথা দাও। তুমি আমার সংসারের ভার নেবে। তোমাকে আমি আমার স্ত্রীর মর্যাদা দেবো।

—আপনার বাবা-মার মত ভালো মানুষ হয় না। এমন আশ্রয় ছেড়ে আমাকে যেতে হচ্ছে; কত বড় হতভাগিনী হলে, তবে এমন হয়।

—বাবা মাকে আপন করে নেবার মত ধৈর্য তোমার থাকবে কিনা জানি না। তবে আমি তোমাকে এই সংসারেই প্রতিষ্ঠা করব।

—আপনি এবার চলে যান। এখনই মা হয়ত উঠে এসে আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

শঙ্কর আর কথা না বলে তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর ভাবল বাবাকে কি বলে বোঝাবে।

একটু পরেই মা বেরিয়ে শঙ্করকে ডাকলেন—ওরে শঙ্কর, এবার উঠে হাতমুখ ধুয়ে আয়। একটু এগিয়েই দেখেন সুভদ্রা বারান্দায় বসে আছে।

মায়ের ডাক শুনে শঙ্কর এসে বলল—তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ি।

মা বললেন—সে কিরে? মেয়েটাকে কিছু খাইয়ে দি। তুইও একটু কিছু মুখে দে।

সুভদ্রা বলল—না মা, এখন আর কিছু খাব না। তবে যদি কখনও বিপদে পড়ি তখন আবার আপনার আশ্রয়ে উঠব। তখন অভাগীকে পায়ে ঠাঁই দেবেন।

মাকে উপুড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায় সুভদ্রা। ক্ষণকাল শঙ্করের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে—চলুন।

শঙ্কর বলল—আর দেরী নয়, ভোর হওয়ার আগে আমাদের পৌছতে হবে।

মার চোখ দিয়ে কয়েকবিন্দু জল গড়িয়ে পড়ল।

শঙ্কর আর সুভদ্রার যাত্রা শুরু হল। পথ চলতে চলতে টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে ফাঁকে উভয়ের দূরত্ব কমে আসে; এ শুধু হাতে হাত রেখে চলা নয়, মন দিয়ে আর একটি মনকে অনুভব করা। গ্রাম্য নির্জন রাস্তায় চলেছে দুটি তরুণ-তরুণী। উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অলক্ষ্যে বিচিত্র রাগিনী বেজে ওঠে। দুই পাশের কাশ বন নুয়ে পড়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রেমিক যুগলকে জানায় তাদের প্রণতি; প্রভাতের তরুণালোক বলে—'এস', 'এস'। এমনি

করে গ্রামের ঐ মেঠো পথ যেন অনেক ছোট হয়ে গিয়ে মেশে নদীর কিনারায়। পথ ফুরায় এসে নৌকার ঘাটে।

শঙ্করের হাত ধরে ধরে সুভদ্রা নৌকায় উঠল।

নৌকায় উঠে সুভদ্রা বলল—এই মা গঙ্গা আর আকাশের রাত্রি-শেষের ঐ চাঁদকে সাক্ষী রেখে বল, আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে তার কোন অমর্যাদা হবে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে পর্যন্ত তুমি আমায় স্পর্শ করবে না।

শঙ্কর বলল—ঐ দেখ সূর্য উঠছে। আজ থেকে সুরু হল আমার পরীক্ষা। ভালোবাসায় তোমায় জয় করে নেব। তোমার গর্ভের সন্তান আমারই পুত্র।

সুভদ্রা আর পারল না স্থির থাকতে। মনে হল, এত সুখ কি ওর ভাগ্যে সইবে। তবু আত্মপান্ত সমস্ত ঘটনা শঙ্করকে বলে ফেলল। তারপর বিহ্বলের মত হাঁটুর মধ্যে মুখ লুবিয়ে কাঁদতে লাগল।

আর একজনও তাকে একদিন ভালবেসে কাছে টেনেছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস! সে মানুষটাকে ভুলতে চেষ্টা করতে হবে। শঙ্কর তার কথা সব জানল, সব শুনলো; কিন্তু কোন বিরূপ সমালোচনা করল না। নিজের আনন্দেই সে মগ্ন। তৈরী হতে হবে, প্রস্তুত হতে হবে, এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার সঙ্কল্পে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হল। এমন মানুষকে কী ফিরিয়ে দেওয়া যায়। সুভদ্রা শঙ্করের পা ছুঁয়ে বলল—আজ থেকে তুমিই আমার দেবতা।

শঙ্কর সুভদ্রাকে দু'হাত দিয়ে তুলে ধরে। তারপর উভয়ে নৌকার বাইরে এসে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায়।

দুটি মানুষ গভীর বিশ্বাসে পরস্পরকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চাইছে। এই মুহূর্তটাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যেই বোধ করি এক ঝাঁক পাখী ওদের মাথার উপর দিয়ে বিচিত্র কলতান তুলে চলে গেল।

॥ পনেরো ॥

তাপসী প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, যুক্তিও দেখিয়েছিলেন, কিন্তু অমিয়রঞ্জন কেতকীর ইচ্ছাটাকেই অনুমোদন করলেন। অমিয়বাবু বুঝতে পেরেছিলেন, কেতকী এখন নিজেকে নানা কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে চায়। নানা কাজের মধ্যে আবিষ্ট থেকে সব কিছু ভুলে থাকতে চায়। সে বুঝতে পেরেছে যে, তার কাছে সে নিজেই একটা সমস্যা। তাই কেতকী যখন এসে বলল যে, নার্সারী স্কুলে সে চাকরী করবে তখন অমিয়বাবু আর অমত করেন নি। তিনি বলেছিলেন, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। তোর এখন একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু পাছে তুই কিছু মনে করিস তাই বলতে পারছিলাম না।

কিন্তু তাপসী বললেন—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? তুই চাকরী করতে যাবি কোন্ দুঃখে?

অমিয়বাবু বললেন—দুঃখ ঘুচাবার জন্যে কেতকী কাজ করতে যাচ্ছে না! সে কাজ করতে যাচ্ছে অন্য কারণে। আমারও ইচ্ছে, হয় কেতকী পড়াশোনা করুক, নয় তো কোনও কাজ কর্ম করুক!

বাবার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে কেতকী যেন উচ্ছল হয়ে উঠল। বলল—আমার ইচ্ছে কি জানো বাবা? কাজটা শিখে নিয়ে নিজেই একটা ছোট খাটো স্কুল খুলবো। তখন কিন্তু তোমায় সাহায্য করতে হবে। মানে আর্থিক সাহায্য করতে হবে। আমার বিয়ের জন্যে যে টাকা তুমি খরচ করবে বলে ঠিক করে রেখেছ, অন্ততঃ সেই টাকাটা আমাকে দিতে হবে।

তা' হবে না!—তাপসী বাধা দিয়ে বললেন—বিয়ের টাকা বিয়েতেই খরচ হবে।

অমিয়বাবু বললেন—সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে, এখন তো তুই কাজে লেগে পড়। স্কুলটা কোথায় ?

—বজবজে, চোরেল বাজারের কাছেই। গঙ্গার ধারে সুন্দর জায়গা। কাগজে সেদিন একটা রিভিউ বেরিয়েছিল, সঙ্গে চাকরী খালির বিজ্ঞাপনও ছিল। নামটাও বেশ—শিশুতীর্থ। দরখাস্ত করার পর ইন্টারভিউও পেয়েছি।

তাপসী এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, বললেন—ইন্টারভিউ যখন পেয়েছিস্ তখন একবার দেখে শুনে আয়। ভাল লাগে করবি, না লাগে তো ছাড়তে কতক্ষণ!

এতক্ষণে অমিয়বাবু আশ্বস্ত হলেন।

ইন্টারভিউ দিয়ে এসে কেতকী যেদিন বলল যে, তাকে স্কুলেই থাকতে হবে। বাড়ী থেকে যাওয়া আসা করা চলবে না, সপ্তাহান্তে একদিনের জন্য বাড়ী আসতে পারবে।

সেদিন অমিয়বাবুও ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

কেতকী মায়ের কাছে গিয়ে মায়ের মাথায় কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—তুমি যদি রাগ না করো, তাহলে আজ সব কথা বলবো।

—রাগ করতে যাবো কেন! বল্ না।

—হিমাংশুবাবুর বাড়ীতে সেদিন গিয়েছিলাম। তিনিই আমাকে বললেন, এই ধরনের কাজ শিখে নিতে। আমাদের দেশে এখন এর খুব প্রয়োজন। তাঁর কথাতেই উৎসাহ পেয়েছিলাম। উনিই বলেছিলেন দরখাস্ত ছেড়ে দিতে। এখন তোমরা যদি আমাকে যেতে না দাও উনি কি ভাববেন বল তো ?

তাপসী বললেন—আমি আবার কখন বারণ করলাম। উনিই তো একটু ভাবনায় পড়ে গেছেন। একা একা থাকবি।

—আজকাল লেখাপড়া শেখার জন্যে কত মেয়ে তো ইউরোপে যাচ্ছে। আর এতো এইখানেই।

অমিয়বাবু মুচকি হাসি হেসে বললেন—তা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। কিন্তু তোকে ছেড়ে তো কোনও দিন থাকি নি। তাই মনটা একটু অস্থির হয়েছিল। যাক আমাদের এখন আর কোনও আপত্তি নেই, তুই বরং যাবার জন্যেই তৈরী হয়ে নে।

কেতকীর কথা শুনে তামসী বুঝতে পারলেন যে, হিমাংশু আর কেতকীর মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে। তাই খুশী হয়ে, কেতকীর যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, যাতে সত্যি সত্যি এ-কাজে সে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারে তার জন্যে তিনিও সচেষ্ট হলেন।

মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই কেতকী একদিন চলে এল চোরেঙ্গের শিশুতীর্থে। কলকাতার কাছেই একটি সুন্দর পল্লী পরিবেশ। কেতকী একখানা ঘর পেয়েছে। ছোট্ট সাজানো গোছানো ছবির মত। কেতকী তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

তিন চার বছর থেকে সাত-আট বছরের প্রায় পঞ্চাশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এদের কাজ সুরু হয়েছে। তার মধ্যে পনেরোটি ছেলেমেয়ে স্কুলেই থাকে।

সকাল থেকেই কাজ সুরু হয়। প্রাতরাস সেরে ছেলে মেয়েদের নিয়ে প্রার্থনায় বসতে হয়। আধো আধো গলায় হাত জোড় করে ছেলেরা বলে, "তুমি নির্মল কর, সুন্দর কর, মলিন মর্ম মুছায়ে"। প্রার্থনা শেষ হলে ওরা চলে যায় পড়ার ঘরে। সেখানে বসে বসে যে যার পড়া করে নেয়, অংক কষে। তারপর দশটায় ক্লাস সুরু হয়।

সেদিন সকালে প্রার্থনা শেষ করে এসে নিজের ঘরে বসে বসে কেতকী একটা শিশু-মনস্তত্বের বই পড়ছিল। পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে পড়ে গেল জনার্দনের কথা।

কতদিন হয়ে গেল, জনার্দনের কোনও খবর নেই। চুপি চুপি সেই যে পালিয়ে গেছে, তারপর শুধু একখানা চিঠি দিয়েছিল জনার্দন। তাতে লিখেছিল—এবার থেকে আমি গাঁয়েই থাকবো।

কলকাতায় আর যাবো না। জমি-জায়গা যা আছে তাতেই চলে যাবে। দিদিমণি, আসবার আগে আপনার অনুমতি নিয়ে আসি নি, তার জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

কেতকী সে চিঠির উত্তরও দিয়েছিল। তাতে লিখেছিল তুমি ক্ষমার অযোগ্য, তাই তোমাকে ক্ষমা করতে পারলাম না। তবে যদি কোনও দিন বিপদে পড়ো তাহলে সোজা চলে আসাবে আমার কাছে, কোনও সংকোচ করো না।

এরপর জনার্দন আর চিঠি দেয় নি। কেতকীও কোনও খোঁজ নেয় নি। আজ হঠাৎ বই পড়তে পড়তে জনার্দনের কথা মনে আসতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল কেতকী। জানলা দিয়ে দেখতে লাগল হাঁসগুলো খেলা করছে হ্রদে। ওরা কত সুখী! কত সহজ সুন্দর ওদের জীবন! ভাবতে ভাবতে দূরে গেটের দিকে তাকাল কেতকী। দেখল, একটা ছেলে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। বলছে—দিদিমণি, দিদিমণি, ছেলেধরা!

কেতকী বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল, একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষচুল, একমুখ দাড়ি। গায়ে ময়লা জামা কাপড়। হাত নেড়ে নেড়ে বোধহয় কেতকীকেই ডাকছে। কেতকী ঝিকে ডেকে বলল—দেখে এস তো লোকটা কি চায়? বোধহয় ভিখিরী।

ঝি এসে বলল—ভিখিরী হতে যাবে কেন? আপনার নাম জানে। কেতকী দিদিমনিকে একটু ডেকে দিতে বলল।

কেতকী দিদিমণি! তা হলে কি জনার্দন! কেতকী চমকে উঠল! কেতকী আবার ঐ অদ্ভুত মানুষটার দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে গেল গেটের দিকে। জনার্দনকে দেখেই কেতকী চিনল। সেখানে দাঁড়িয়েই অনেক কথা হল।

জনার্দন বলেছিল—সুভদ্রা, আমার বৌ পালিয়েছে, কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। এখন কি উপায় হবে?

—কিন্তু লোক বেচে আছে ?

—তা জানি না, তবে আপনি যদি একটু খুঁজে দেখেন।

—কিন্তু আমার খোঁজ পেলে কি করে ? বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি ?

—হ্যাঁ, কর্তাবাবু তোমার ঠিকানা বলে দিলেন।

—তা হলে তুমি আমাদের বাড়ীতেই যাও। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কোনও কথা হবে না। আমি এখনই ছুটি নিয়ে যাচ্ছি।

কেতকী নিজের ঘরে না ঢুকে সোজা চলে গেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে। কুন্তলাদি কাজ করছিলেন। কেতকী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল—আমাকে এখুনি বাড়ী যেতে হবে। আমাদের পুরোন চাকরটা ফিরে এসেছে, তার ভারী বিপদ। বিকালের দিকেই চলে আসবো।

কেতকীর দিকে না তাকিয়েই কুন্তলাদি বললেন—বাড়ীতে যখন বিপদ, তখন তোমাকে আর আটকে রাখি কি করে! এখানকার অবস্থা তো তোমার অজানা নেই, বিকালেই চলে এসো!

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কেতকী তখনই বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে ভাবতে লাগল, জনার্দন বিপদে পড়ে এসেছে দিদিমণির কাছে। দিদিমণি ছাড়া আর তার কেউ নেই।

সুভদ্রার নামটা এর আগেও শুনেছে কেতকী। কিন্তু জনার্দনের সঙ্গে যে সুভদ্রার বিয়ে হয়েছে সে-সব কথা জনার্দন জানায় নি। বিয়ে হবার পর মেয়েটা পালালো কেন? জনার্দন নিশ্চয়ই কিছু গোপন করছে। কি এমন ব্যাপার থাকতে পারে, যা জনার্দন গোপন করছে ?

জনার্দনের মধ্যে দুটো স্পষ্ট পরিবর্তন কেতকী লক্ষ্য করেছে। জনার্দনের মুখচোখে শিশুর সে-সারল্য আর নেই, আর কেতকীর প্রতি তার সম্ভ্রম বোধ আরও বেশী গভীর হয়েছে। অর্থাৎ কেতকীর থেকে অনেক দূরে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে।

সুভদ্রা সম্বন্ধে যে-কৌতূহল কেতকীকে এতক্ষণ অস্থির করে তুলেছিল এখন আর তা নেই। কেতকী স্থির হয়েছে এই ভেবে যে, সুভদ্রা

মেয়েটি আর যাই হোক, পাঁচটা মেয়ের মত সাধারণ নয়। কোন মেয়ের পক্ষে স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যাওয়া কম সাহসের কথা নয়। ওর চলে যাওয়াতে কেতকী যেন মনে মনে খুশী হয়েছে! আর সেই সঙ্গে ভেবেছে, এই শাস্তিটুকু জনার্দনের প্রাপ্য ছিল। অর্থাৎ কেতকীর ধারণা সুভদ্রার কোনও দোষ নেই। সব কথা না জেনে শুনেই কেতকী বুঝতে পেরেছে, পালিয়ে যাওয়া ছাড়া বোধ হয় সুভদ্রার আর কোনও উপায় ছিল না।

বাড়ীতে গিয়ে কেতকী দেখল, বাইরের ঘরে জনার্দন বসে আছে। ভেতরের কেউ হয় তো জানেই না। তাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো কেতকী। মা বাবা ও দুজনকেই জনার্দনের বিপদের কথা শোনালো কেতকী, কিন্তু কেউ কোনও উত্তর করলেন না। গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

জনার্দন দূরে বসে বসে এতক্ষণ দিদিমনির কথা শুনছিল, হঠাৎ কি ভেবে উঠে পড়ল। তারপর ভয়ে ভয়ে বলল—আমি এখন যাই দিদিমণি, আপনারা যা ভাল বুঝবেন করবেন। খোঁজ খবর যদি পান, দয়া করে আমাকে জানাবেন।

—সে কি, এলবেলায় না খেয়ে কোথায় যাবি? অমিয়বাবু তাকে ফিরতে বললেন।

জনার্দন আবার সেই জায়গায় এসে বসল।

অমিয়বাবু বললেন—তুইও চান খাওয়া করে নে কেতকী। দুপুরের দিকে ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাবে। ব্যস্ত হয়ে তো লাভ নেই। বেঁচে থাকলে, খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তোকে আর মন খারাপ করতে হবে না জনু। আমাদের কাছে যখন এসেই পড়েছিস্ তখন আর তোর ভাবনা কিসের। এতদিন পরে এলি, দু'চার দিন থেকে যা। তামসী উঠে চলে গেলেন।

খাওয়ার পর কেতকী জনার্দনকে বলল—সুভদ্রা যখন পালিয়েই গেছে, তখন সে তো তার নিজের পথ বেছে নিয়েছে। এখন

খোঁজ পাওয়া গেলেই যে সে ফিরে আসবে তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। মিছিমিছি তার জন্যে হা-হুতাশ না করে, দেশে গিয়ে আর একটা বিয়ে করে ঘর-সংসার করগে, যাও।

তামসী বললেন—আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। জনির এখন তাই করা উচিত। পুরুষ মানুষ এতে মুষড়ে পড়লে চলবে না।

অমিয়বাবু জনার্দনের মুখের দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—জন, দিদিমণির কথা শুনলি তো?

জনার্দন মাথা নাড়ল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

অমিয়বাবু বললেন—তোর প্রস্তাব জন্ মেনে নিতে রাজী নয় কেতকী। তবে এক কাজ কর। কালই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দে। জনার্দনের কাছ থেকে সব খবরাখবর জেনে নে। শুভদ্রার বয়স কত, কি রকম দেখতে, কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। লালবাজার এবং আকাশবাণীতেও খবর দিয়ে দে। তারপর দেখা যাক।

হ্যাঁ, সেই ভাল।—এতক্ষণ জনার্দন কথা কইল—আমি দিদিমণিকে সব জানিয়ে দিয়ে যাবো। খবর পেলে আপনারা দেশে একটা চিঠি দিয়ে দেবেন, আমি চলে আসবো।

কেতকী জনার্দনের দিকে একবার তাকাল। তারপর তাড়াতাড়ি ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

## ॥ চৌদ্দ ॥

পত্রিকায় যথারীতি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হল। আকাশবাণী থেকে সংবাদ প্রচার করা হল, কিন্তু কোনও লাভ হল না। কোনও খবরই পাওয়া গেল না। অথচ দেখতে দেখতে প্রায় দু'বছর কেটে গেল। অন্যান্য অনেক অতীত ঘটনার মত ক্রমশঃ সুভদ্রাকে এরা সবাই ভুলে গেল। মাঝে মাঝে জনার্দনের চিঠি আসতো দেশ থেকে, ক্রমশঃ সেটাও সংখ্যায় কমতে কমতে এক সময় একেবারে বন্ধই হয়ে গেল।

কেতকী ভাবল, এই বোধহয় ভাল হল। আর দায়িত্বের কিছু রইল না। জনার্দন এসে আর বিরক্ত করবে না।

হঠাৎ মনের মধ্যে গভীর উত্তেজনা অনুভব করল কেতকী। অধ্যাপক হিমাংশু ব্যানার্জিকে সব কথা না জানিয়ে কেতকী যেন স্বস্তি পাচ্ছে না। তক্ষুনি চিঠি লিখতে বসল হিমাংশুবাবুকে।

একটি একটি করে অনেক কথা লিখল কেতকী। নার্সারি স্কুলের কাজের মধ্যে নিজেকে নিবেদন করে যে আনন্দ কেতকী পেয়েছে, সে-সব কথা হিমাংশুকে না জানিয়ে পারল না। সব শেষে জনার্দন আর সুভদ্রার কাহিনী বর্ণনা করে চিঠি শেষ করল।

হিমাংশু সত্যি সত্যিই স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তবু তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

সুচরিতাষু,

আপনার কাছ থেকে কোনও দিন চিঠি পাবো এ-প্রত্যাশা আমি করি নি। আপনার কর্মজীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস পাঠ করে শুধু আনন্দিত হই নি, বিস্মিতও হয়েছি। মহান আদর্শকে সামনে রেখে, জীবন পথের কত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, আশ্চর্য বলিষ্ঠতার সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে চলাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারছি না।

আপনার বান্ধবী আপনার খবরাখবর আমাকে মাঝে মাঝে জানিয়ে যান। তাঁর কাছ থেকে অনেকদিন আগে শুনেছিলাম যে, কিছু একটা করবার জন্যে মনে মনে আপনার প্রস্তুতি চলেছে।

এখন সে-আলোচনা থাক। বিশেষ একটা জরুরী খবর আছে। সেই কথাই আগে বলি।

প্রায় মাস তিনেক হল আমাদের নীচের তলায় এক দম্পতী বাস করছে। মার কাছ থেকে শুনেছি বউটির নাম সুভদ্রা। ওদের একটি ছেলেও আছে। ওরা স্বর্ণকার। স্বামী বহুবাজারে কোনও এক জুয়েলারী দোকানের কারিগর। সুন্দর, সচ্ছল, ছোট্ট, সংসার। অথচ মাঝে মাঝে শুনি ছেলেটিকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্রী খিটিমিটি লাগে। মাঝে মাঝে বউটি ওপরে মায়ের কাছে এসে গল্পের ছলে, অনুযোগ আর অভিযোগের কথা জানায়।

শঙ্করবাবু ( বউটির স্বামী ) ছেলেটিকে অন্যায়ভাবে শাসন করেন। দু-আড়াই বছরের ছেলে, যেমনি মোটাসোটা তেমনি দামাল। সুভদ্রার পক্ষে সব সময় তাকে সামলানো সম্ভব হয়ে ওঠে না, সুভদ্রার সেইটাই নাকি অপরাধ। শঙ্করবাবু ছেলেটিকে এমন ভাবে মার ধোর করেন যে, সুভদ্রা তা সহ্য করতে পারেন না।

সুভদ্রা সেদিন আমার সামনেই মাকে বলছিলেন—কোনও স্কুলে ওকে ভর্তি করে দেওয়া যায় কিনা। সেইখানেই থাকবে, লেখা পড়া শিখবে, মানুষ হবে।

মা আমাকে বলেছিলেন—হ্যারে, কোনও আবাসিক নার্সারি স্কুল কোথাও জানা আছে ?

অন্য মনস্ক ভাবে বলেছিলাম—তা কেন থাকবে না। এমন অনেক স্কুল তো আজকাল হয়েছে। কিন্তু তার আগে শঙ্করবাবুর মতামতটা নিতে হবে।

সুভদ্রা মার দিকে চেয়ে, ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে বলেছিলেন – না, ওর মতামতের কোনও প্রয়োজন হবে না।

তখন ভেবেছিলাম শঙ্করবাবুর ওপর রাগ করেই হয়তো সুভদ্রা কথাগুলো বলেছিলেন, কিন্তু পরে মার কাছ থেকে যা শুনলাম, তাতে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। ছেলেটি নাকি শঙ্করের নয়। ওদের ভেতর কোথাও গোলমাল আছে। তখন বুঝলাম নিজের ছেলে হলে, ঐ দুধের বাচ্চাকে কেউ অমন করে মারে না।

শেষকালে ঠিক করলাম ঘর ছেড়ে দিয়ে ওদের চলে যেতে বলবো। কেননা ভবিষ্যতে এসব নিয়ে যদি কোনও গণ্ডগোল বাধে তখন আমাদেরও হয়তো তাতে জড়িয়ে পড়তে হবে।

এমন সময় আপনার চিঠি পেলাম। পড়তে পড়তে কেন জানি না, আমার বার বার মনে হয়েছে, নীচের বউটিই জনার্দনের সুভদ্রা। কিন্তু সোজাসুজি এ-প্রশ্ন আমরা কেউই তাকে করতে পারি নি। তাই ভাবছিলাম ছেলেটিকে যদি আপনাদের স্কুলে কোনও রকমে ভর্তি করাবার ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে ছেলেটিও বাঁচবে এবং আমার ধারণা আদৌ সত্যি কিনা, সেটাও পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

আপনার উত্তর পেলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। আশাকরি ভালই আছেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ।

—হিমাংশু

কেতকী এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা একবার শেষ করে আর একবার পড়তে লাগল। এবার একটু আস্তে আস্তে পড়ে ভাবতে লাগল, এখুনি হিমাংশুবাবুর বাড়ীতে গেলে কেমন হয়। সুভদ্রাকে চোখে দেখবার জন্যে মনটা কেমন যেন ছট্‌ফট্ করতে লাগল। শঙ্কর ছেলেটি কে? জনার্দন কি তাকে চেনে না!

কেতকী এবার জনার্দন, সুভদ্রা আর শঙ্করকে সরিয়ে দিয়ে হিমাংশুর কথা ভাবতে লাগল। অধ্যাপক হিমাংশু ব্যানার্জি একদিন তার গৃহশিক্ষক ছিলেন। সেই সুযোগে কেতকী তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিল। বাবা-মার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে এক করতে পারলে, হয়তো এতদিন হিমাংশুর ঘরণী হতে পারত কেতকী। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা

অন্তরূপ ছিল বলেই কেতকী তখন নিজেকে দূরে রেখেছিল। আর আরতি সেই সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছিল। এখানে আরতি মাঝে মাঝে আসে, অযাচিত ভাবে হিমাংশুর খবরাখবর দিয়ে যায়, আবার হিমাংশুর কাছে গিয়েও অনেক কথা শুনিয়ে আসে। একটা উদ্দেশ্য নিয়েই সে এই লুকোচুরি খেলা সুরু করেছিল।

ঢং ঢং করে ক্লাসের ঘন্টা বাজতেই কেতকী চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় চোপড় ঠিক করে নিয়ে চুল আঁচড়ে, মুখচোখ পরিষ্কার ক'রে মুছে নিয়ে টলতে টলতে ক্লাশে গিয়ে ঢুকল। টিফিন খাওয়া আর হল না। খেতেও ইচ্ছে নেই। ক্লাশে বসে বসেই চিঠির উত্তরটা লিখে ফেলল কেতকী।

বেশী কথা লিখল না। খুবই সংক্ষেপে শেষ করল। সুভদ্রা আর তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আসবার জন্যে হিমাংশুকে আমন্ত্রন জানাল।

হিমাংশুর দীর্ঘ পত্র কেতকীর সমস্ত দেহমনকে যে কী গভীরভাবে আলোড়িত করেছে, এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যেই কেতকী তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করে ফেলল।

হিমাংশুর বুঝতে বাকী রইল না যে, কেতকী যখন চিঠি লিখছিল তখন সে তার মনের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে নি এবং সেই জন্যেই তার এই ছোট্ট উত্তর। হিমাংশু মনে মনে খুব খুশী হলেন। কেতকীর আমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে তখনই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

শঙ্কর বাড়ীতেই ছিল। তখুনি তাকে ডাকলেন। তারপর বুঝিয়ে বললেন সব ঘটনা।

সব কথায় শুনে শঙ্কর বলল—আমিও এতদিন ধরে এই কথাই ভাবছিলাম। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে।

হিমাংশুকে চুপ করে থাকতে দেখে শঙ্করও ভাবতে লাগল—সুবলকে কেন সে সহ্য করতে পারবে না। জেনেশুনেই তো সুভদ্রাকে বিয়ে করেছিল। অথচ ইদানীং সুবলের জন্যে সুভদ্রাকেও তার ভাল

লাগে না। কিন্তু দিন আগে পর্যন্তও সুবলকে সে খুবই ভালবাসত।

শঙ্করের মনে হল, সুবলকে দূরে রাখলে হয়তো সংসারে তার শান্তি ফিরে আসবে। মাষ্টার মশাই ( হিমাংশুকে শঙ্কর মাষ্টার মশাই বলে ডাকে ) যদি ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে সত্যিই তারা যেন বেঁচে যায়। ছেলেটাকেও আর মারধোর করতে হয় না।

হঠাৎ হিমাংশু হাসতে হাসতে বললেন—তা নয় শঙ্করবাবু, ছেলে আপনাদের, তার ভালমন্দ আপনাদেরই ভাবা উচিত! আমরা বড় জোর বলে দিতে পারি কোন্ পথটা সোজা, কোন্টা বাঁকা, কিন্তু সবই করতে হবে আপনাদের।

—তাতো নিশ্চয়ই! আজই আপনি দয়া করে ওদের নিয়ে যান। আমি আর সঙ্গে গিয়ে কি করবো। একদিন আবার কামাই হয়ে যাবে।

হিমাংশুবাবু শঙ্করের কথায় রাজী হয়ে তৈরী হতে বললেন। স্কুল বসবার অনেক আগেই তাঁরা এসে পড়লেন। সুভদ্রা আর তার ছেলে সুবলকে সঙ্গে নিয়ে হিমাংশুবাবু স্কুলে এসে পৌছলেন।

কেতকী বাগানে বেড়াচ্ছিল, ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। ছেলেটির কাছে গিয়ে গালদুটো টিপে আদর করল। হাত তুলে নমস্কার জানালো হিমাংশুবাবু আর সুভদ্রাকে। তারপর ওদের সঙ্গে নিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকলো অফিস ঘরে।

কুন্তলাদিকে সব কথা আগে থেকেই বলে রেখেছিল। কুন্তলাদি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি?

সুভদ্রা বলল—ওর নাম সুবল, সুবল চন্দ্র দত্ত।

কেতকী তখন সুভদ্রাকে দেখছিল। তার চোখ মুখ মাথার চুল, দেহের গড়ন, গায়ের গহনা, সব লক্ষ্য করছিল। আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল সুবলের দিকে। ছেলেটার মুখে কোথাও জনার্দনের আদল আছে কিনা পরীক্ষা করল।

কুন্তলাদি জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারবেন তো? বড় ছেলেমানুষ।

—দু' একদিন কষ্ট হবে, তারপর নিশ্চয়ই অভ্যেস হয়ে যাবে।

—ছেলেটির বাবার নাম কী?

সুভদ্রার মুখটা একটু বিবর্ণ হল। ঘোমটা টেনে চোখ ঢাকবার চেষ্টা করল।

কেতকী সব লক্ষ্য করছিল। এবার সে মৃদু হেসে বলল—আপনিও তেমনি। স্বামীর নাম কি করে বলবে? আমি বলছি লিখে নিন্—ওর বাবার নাম শ্রীশঙ্কর দত্ত।

কেতকীর দৃষ্টি এড়ালো না। এর পর অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে কেতকী তাদের নিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল।

কেতকী হিমাংশুবাবুকে জিজ্ঞেস করল—স্কুল কেমন দেখলেন?

হিমাংশুবাবু মুচকি হেসে বললেন—এক কথায় মনোরম। আর একদিন আসবো। ঘুরে ঘুরে সব দেখতে হবে।

—নিশ্চয়ই! একদিন কেন। যখনই ইচ্ছে হবে চলে আসবেন।

কেতকীর কথা শেষ হলে সুভদ্রা বলল—আপনার ভরসাতেই ছেলেটিকে রেখে গেলাম। মাষ্টার মশায়ের মার কাছ থেকে আপনার অনেক কথা শুনেছি। ছেলেটি ভারী দুরন্ত। হয়তো অনেক অন্যায় কাজ করবে। আপনি কিছু মনে করবেন না। ছেলের হয়ে আমি আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।—বলেই সুভদ্রা চোখ মুছতে লাগল।

—ছিঃ, ছিঃ! কাঁদছেন কেন? আপনার কোনও ভাবনা নেই। এখানে আরও অনেক ছেলেমেয়ে আছে। তাদের সঙ্গ পেলেই দেখবেন আপনাকেও ভুলে যাবে। তখন ছেলের ওপর আপনারই রাগ হবে। কাল বাদ দিয়ে পরশু আবার আসবেন। এখন মাঝে মাঝে আপনাকে আসতে হবে। তাতে আপনার মনটাও ভাল থাকবে ছেলেরও এখানে মন বসবে।

স্কুলের সময় হয়ে আসছে দেখে কেতকী উঠে পড়ল। সুবলকে বিনয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল চান করতে। সুভদ্রা অবাক হয়ে দেখল, সুবল আর মায়ের দিকে ফিরেও তাকাল না। একদম অচেনা একজনকার হাত ধরে কেমন চলে গেল। মনে মনে ভাবল, এরা কি জাদু জানে।

কেতকী বলল—আপনি তো ভেবেই সারা হচ্ছিলেন, দেখলেন তো কেমন চুপচাপ চান করতে চলে গেল।

সুভদ্রা চোখ দুটো বড় বড় করে বলল—আপনি বিশ্বাস করবেন না দিদি, এই চান করা নিয়েই কতদিন আমাদের তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। ছেলেটা মার খেয়েছে তবু চান করে নি। সত্যি দিদি আপনারা জাদু জানেন!

একসঙ্গে ওরা সকলেই হেসে উঠল। হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

গ্রহণ করতে রাজী হন নি। সেই মনস্তাপেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর আর বেশীদিন বাঁচলেন না।

বাবা মারা যাবার পর শঙ্কর চেয়েছিল সুভদ্রাকে বাড়ী নিয়ে যাবে, কিন্তু সুবলের জন্যেই যাওয়া সম্ভব হল না। মায়ের কাছে শঙ্কর এসব কথা বলতে পারে নি। এখনও শঙ্কর মাঝে মাঝে দেশে যায়। খরচ পাতি দিয়ে আসে।

কিন্তু জনার্দন!—কেতকী জিজ্ঞেস করল—জনার্দনের কোনও খবর নাও নি?

—না, দিদিমণি, নিতে সাহস হয় নি। প্রথম প্রথম তার জন্যে কত ভাবনা হ'ত। কত কষ্ট হ'ত। কিন্তু এখন মনে হয় তার সঙ্গে যদি কোনও দিন দেখা হয়ে যায়, তাহলে আমার এই ছোট্ট সংসার একেবারে ছারখার হয়ে যাবে!

কেতকী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল—মায়ের জন্যে তোমার মন কেমন করে না?

—করতো দিদি, মাকে চিঠিও দিয়েছিলুম। মা লিখেছিল, অমন মেয়ের মুখ দেখতে চাই না। তারপর শুনেছি মা শ্বশুর বাড়ী চলে গেছে। যাবার আগে জমুদার সঙ্গে দেখাও করে নি। তাকে আমার ঠিকানাও দেয় নি। দিলে জমুদা হয়তো আমার খোঁজ পেত।

—কিন্তু তোমার উচিত ছিল মায়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আসা। তোমাকে নিশ্চয়ই তোমার মা ক্ষমা করতেন।

—আমিও তাই ভেবেছিলুম, দিদিমণি। মা, আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে। কিন্তু জমুদার ভয়ে আমি ওদিকে যেতে সাহস করি নি। ঠাকুরের কাছে বসে কত কেঁদেছি, কিন্তু মনে বল পাই নি।

সুবল একবার এল আবার চলে গেল। এক সময় সুভদ্রাকেও উঠতে হল। যাবার সময় বলে গেল—জমুদার হাত থেকে আপনি আমায় বাঁচাবেন, দিদিমণি। আপনার কথা সে নিশ্চয়ই শুনবে।

কেতকী সারাদিন ধরে ভাবল। কিন্তু কিছুতেই স্থির করতে পারল না যে, জনার্দনকে এসব কথা জানানো তার উচিত হবে কিনা!

সুভদ্রা অন্যায় কিছু বলে নি। একদিন সে মরতে চেয়েছিল এ-কথা সত্যি, কিন্তু এখন সে বাঁচতে চায়। পৃথিবীর যে-দিকটা রূপ-রস-গন্ধে পরিপূর্ণ, সুভদ্রা তার সন্ধান পেয়েছে। অঞ্জলি ভরে সে পান করতে চায় জীবনের রস, বুক ভরে তার অঘ্রান নিতে চায়, আর চোখ মেলে দেখতে চায় জীবন কত মধুর। তবুও জনার্দনের ভাবনা বিভীষিকার মত মাঝে মাঝে তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, এসব স্বপ্ন হঠাৎ একদিন ভেঙে যেতে পারে। একটা বিকট ঈগল চিন্তা তার কপোতী মনকে মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত করে তোলে। জনার্দনকে সে এখন আর ভালবাসে না, ভয় করে, মৃত্যুকে লোকে যেমন ভয় করে ঠিক তেমনি। সুভদ্রার বিশ্বাস জনার্দন তাকে বাঁচতে দেবে না।

কিন্তু সুভদ্রার ধারণা সত্যি নাও হতে পারে। সুভদ্রা সুখে আছে, ঘর সংসার করছে, এ-কথা শুনে জনার্দন খুশীও হতে পারে। জনার্দন হয়তো চায় সুভদ্রা যেখানেই থাকুক, বেঁচে থাকুক, সুখে থাকুক।

তবুও কেতকীর মনে হল জনার্দনকে ক্ষমা করা সুভদ্রার পক্ষে সম্ভব নয়, উচিতও নয়। সুভদ্রার সম্ভ্রম যে নষ্ট করেছে, সুভদ্রাকে যে সমাজচ্যুত করেছে সে ক্ষমার অযোগ্য। শঙ্করের মত উদার মনের মানুষ পেয়েছিল বলেই সুভদ্রা আজও বেঁচে আছে, নইলে সত্যিই সে আত্মহত্যা করত কিংবা জলের স্রোতে কোথায় তলিয়ে যেত, কেউ তার খবর পেত না।

কিন্তু জনার্দন কি করে এত নীচ হতে পারল! অমন সরল সুন্দর মানুষটা কি করে এত লোভী হল! ওদের বিয়ে হয়ে গেলে এ সব প্রশ্নই উঠত না। বিয়ে হতেও পারতো।

জনার্দনের ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে সুভদ্রা এত নিঃসংশয় কেন? সুভদ্রা পালিয়ে এসেছে বলেই সে নিজেকে অপরাধী ভাবছে। সুভদ্রার

এই অপরাধী মন জনার্দনের প্রতি অবিচার করছে। জনার্দনকে সে ভুল বুঝেছে। যাই হোক সুভদ্রার খোঁজ পেয়ে জনার্দনকে সংবাদ না দেওয়া কেতকীর পক্ষে অন্যায় হবে! কেতকী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সুভদ্রা অন্যায় কিছু করে নি, এই কথাই জনার্দনকে বুঝিয়ে দিতে হবে। রাস্তায় চলতে চলতে মানুষ যদি হোঁচট খায় তাহলে সেই-খানেই সে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে কেন? তাকে হাত ধরে তুলতে হবে, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। শঙ্কর সুভদ্রাকে মরে যেতে দেয় নি। সে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। শঙ্কর সত্যিই সুভদ্রাকে ভালবাসে। সুভদ্রা আর শঙ্কর পরস্পরকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকুক। জনার্দনের এখন আর করবার কিছু নেই এ-কথা বললে জনার্দন নিশ্চয়ই রাজী হবে। সুভদ্রাকে শাস্তি দেবার জন্যে নিশ্চয়ই সে অস্থির হয়ে উঠবে না।

কেতকী সত্যি সত্যি চিঠি লিখল জনার্দনকে: 'সুভদ্রার সংবাদ পাওয়া গেছে। পত্রপাঠ তুমি চলে আসবে। সুভদ্রার মাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে।' চিঠি শেষ করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কেতকী।

চিঠি পেয়েই জনার্দন যখন শিশুতীর্থে এসে পৌঁছুল তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। বাইরে বেরুবার জন্যে কেতকী তৈরী হচ্ছিল। সুবলকে নিয়ে সুভদ্রাদের ওখানে তার যাবার কথা। সুবলের সাজ গোছ হয়ে গেছে। বাগানে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে ছুটতে ছুটতে এসে কেতকীকে বলল—দেখুন, গেটের কাছে কে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের দিকে চাইতেই, শুধু চোখ দুটো নয়, সমস্ত শরীরটাই স্থির হয়ে গেল কেতকীর। পুতুলের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সুবলের হাত ধরে গেটের দিকে যেতে যেতে হাতছানি দিয়ে জনার্দনকে ডেকে বলল—এত বেলা হল আসতে? আর একটু দেরী করলে আমার সঙ্গে দেখা হতো না। তারপর জনার্দনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল কেতকী।

জনার্দন যেন অনেক বদলে গেছে। একটু ধীর স্থির হয়েছে। সুভদ্রা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কৌতূহলও নেই যেন। কেতকী একটু আশ্চর্য হল। আবার প্রশ্ন করল—সুভদ্রার মাকে নিয়ে এলে না? চিঠিতে তো তাঁকে আনতে লিখেছিলাম।

—না। পিসি আসতে চাইল না। পিসি তো দেশে নেই, শ্বশুর বাড়ী আছে। আপনার চিঠি পেয়েই আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলুম। পিসি আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না।

পিসি লোক দিয়ে বলে পাঠালো—সে কালামুখীর মুখ আমি দেখবো না। আমি জানি, সে হতভাগি মরেছে!

—আমিও তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না, দিদিমণি। যার পেটের মেয়ে সেই যখন কোনও খবর নেয় না তখন আমাদের কি বয়ে গেছে। মরুক বাঁচুক সে বুঝবে। আমরা কে?

কেতকী বুঝতে পারল যে, সুভদ্রার ওপর রাগ তার বেড়েছে, কমে নি। এই সময় ওষুধটা প্রয়োগ করলে কাজে লাগবে। কিন্তু তার আগে খাওয়া-দাওয়া করে একটু শান্ত হোক।

জনার্দনের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে কেতকী সুবলকে ডেকে নিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—এ ছেলেটি কে বল দেখি? একে চিনতে পার?

জনার্দন হাঁ করে চেয়ে রইল ছেলেটার দিকে। মনে মনে কি যেন হিসেব করতে লাগল। তারপর বলল—না, চিনলাম না তো!

কেতকী হাসি চেপে বলল—এর নাম সুবল। এর বাবার নাম জনার্দন দাস। মায়ের নাম সুভদ্রা। উঠছ কেন? বসো। আরও কথা আছে। তুমি অনেক কিছু আমাকে জানাও নি, কিন্তু সুভদ্রা সব কথা বলেছে। সুভদ্রার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় নি, বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। সুভদ্রা এখন ভাল আছে। শঙ্করের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তুমি এখন কি করতে চাও? তার সঙ্গে দেখা করবে?

লজ্জায় ও ঘৃণায় জনার্দন কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বলল—না, না! তার মুখ আর আমি দেখবো না।

কেতকী হাসতে হাসতে বলল—চটছো কেন? সে কথা যদি বলো তাহলে তুমিও ঢের অন্যায় করেছ।

—হ্যাঁ, তা করেছি দিদিমণি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন, তা নইলে আমি বাঁচবো না, আমার আর কেউ নেই দিদিমণি।

শিশুর মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল জনার্দন। সুবল পাশে এসে তার কান্না দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ কেতকীর দিকে চেয়ে শাসন করার ভঙ্গিতে বলল—আপনি ওকে বকলেন কেন?

কেতকী হেসে উঠল—দেখছ জনার্দন, তোমার ছেলে তোমায় কত ভালবাসে। তোমার হয়ে আমাকে শাসন করছে।

জনার্দন চোখ মুছতে মুছতে সুবলের দিকে চাইল। সুবলকে কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে হল, কিন্তু পারল না। লজ্জা করতে লাগল।

কেতকী বলল—তুমি যদি সুভদ্রাকে ক্ষমা কর, তাহলে আমিও তোমাকে ক্ষমা করবো।

—ওর সঙ্গে দেখাই করবো না!

—কেন? দেখা করবার জন্যেই তো তুমি এসেছো। দেখা করার ইচ্ছা না থাকলে তো তুমি চিঠি দিয়েই জানাতে পারতে। সুতরাং দেখা তোমাকে করতেই হবে এবং ক্ষমাও করতে হবে।

—বেশ, সে যদি আমার ছেলেকে ফেরৎ দেয় তাহলে আমি তার সব দোষ ক্ষমা করবো। সে যেমন আছে তেমনি থাকবে, আমি আর কিছু বলবো না।

—তাই হবে। সুভদ্রাকে আমি সে কথাই বলবো। কিন্তু এখন তো আর বেরুনো যাবে না। সন্ধ্যে হয়ে এল। কাল সকালেই না হয় ওদের ওখানে খবর পাঠাবো।

খবর পাঠাতে হল না। পরদিন সকালেই সুভদ্রা আর শঙ্কর এসে হাজির হল। গতকাল কেতকীর ওখানে যাবার কথা ছিল,

কিন্তু না যাওয়ায় দু'জনেই ওরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তাই সকাল না হতেই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছে।

শঙ্কর কেতকীকে নমস্কার করল। কেতকী ইশারায় ওদের বসতে বলে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রার্থনা গান গাইতে লাগল।

স্তোত্র পাঠ শেষে ছেলেরা সব চলে গেল খাবার ঘরে। আর কেতকী জনার্দনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো।

জনার্দনকে দেখেই সুভদ্রা আঁতকে উঠল। কি যেন বলতে গেল, কিন্তু পারল না। স্থির হয়ে বসে থাকতেও পারল না, হঠাৎ শরীরটা মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

কেতকী তাড়াতাড়ি মুখে চোখে জল দিতে লাগল। আর হাত পাখাটা টেনে নিয়ে মাথার কাছে বসে জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল। স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগল জনার্দন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরল সুভদ্রার। ঘোমটা টেনে সে এক পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসল।

এবার কেতকী শঙ্করের সঙ্গে জনার্দনের পরিচয় করিয়ে দিল—জনার্দন, ইনি হলেন শঙ্কর দত্ত। সুভদ্রার স্বামী। আর এই হল জনার্দন দাস, সুবলের বাবা।

ভয়ে শিউরে উঠে শঙ্করের দিকে তাকাল সুভদ্রা। দেখল, শঙ্কর হাত তুলে জনার্দনকে নমস্কার করছে।

কেতকী সুভদ্রাকে বলল—তোমার কাছে জনার্দনের একটা প্রার্থনা আছে। সুবলকে জনার্দন নিজের কাছে রাখতে চায়। আমার মনে হয় এতে তোমার আপত্তি করা উচিত হবে না।

শঙ্কর বলল—না, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। সুভদ্রা কিন্তু চুপ করে রইল।

কেতকী আর একবার জিজ্ঞেস করল। সুভদ্রা আর চুপ করে থাকতে পারল না। হাতের আঙটিটা খুলে নিয়ে বলল—আপনি যখন বলছেন, তখন তাই হোক। সুবলকে আমার আশীর্বাদ

জানিয়ে এই আঙটিটা তাকে দিলুম। আপনি ওকে দিয়ে দেবেন। আর মাঝে মাঝে ওকে দেখে যাবার অনুমতি দেবেন।

জনার্দন অবাক হয়ে দেখে তারই দেওয়া সেই আঙটিটি। জনার্দনের দেওয়া কোনও কিছুই সুভদ্রা আর রাখতে চায় না। জনার্দনকে মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে চায়। জনার্দনের মনে হল কাজটা বোধহয় ভাল হল না। সুবল ওর কাছে থাকলেই ভাল হতো। তাতে সুভু কোনও দিনই জনার্দনকে ভুলতে পারতো না।

মুখে কিন্তু সে কথা বলতে পারল না জনার্দন। যেমন ছিল তেমনি চুপ করে বসেই রইলো। বসে বসে দেখতে লাগল শঙ্করের সঙ্গে সুভদ্রা ফটক পেরিয়ে লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সুভদ্রার পায়ে হোঁচট লাগল, শঙ্কর তাড়াতাড়ি তার হাতটা ধরে কাছে টেনে নিল, আর ছাড়ল না।

কেতকী বাঁচল! মনটা শুধু নয়, শরীরটাও যেন হাল্কা বলে মনে হচ্ছে। নানা কাজের মধ্য দিয়ে কয়েকটা দিন যে কেমন করে কেটে গেল, তা খেয়ালই রইল না। সেদিন বিকালের দিকে ভেতরের চাপা আনন্দটা হঠাৎ উচ্ছল হয়ে উঠলো! ছেলে মেয়েদের নিয়ে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল কেতকী, সেও যেন ওদের খেলার সঙ্গী। দৌড়োতে দৌড়োতে গেল হ্রদের দিকে। সেখানে জনার্দন মাটি খুঁড়ছিল। সব্জী লাগানো হবে বলে জমি তৈরী করছিল।

জনার্দন আর এখন বাইরের লোক নয়। শিশুতীর্থের একজন কর্মী। অফিস পিয়ন, কিন্তু অবসর সময় সে নিজের ইচ্ছাতেই বাগানের কাজ করে।

কেতকী এসে বসল একটু দূরে। বসে বসে দেখতে লাগল জনার্দনের কাজ।

জনার্দনের কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। কেতকীর মায়া হল। বলল – সন্ধ্যে হয়ে গেল, আর কতক্ষণ কাজ করবে? জলদিয়ে আজ বরং মাটিটাকে ভিজিয়ে রাখো, কাল সকালে কোপাতে আর কষ্ট হবে না।

জনার্দন আকাশের দিকে চাইল। বলল—আকাশের মুখটা দেখছেন দিদিমণি। যেন পাঠশালার গুরুমশাই। তিরিক্ষি হয়ে আছে মেজাজ। জল ঢালবার নাম নেই। জলঢালা আমাদের কাজ নয়, ওটা ঐ আকাশের কাজ। মাটি খট্‌খটে। আকাশ থমথমে। কে কার কথা শোনে। এরপর দেখবেন এই ফাটলের ভেতর দিয়ে হাওয়া বইবে তখন মনে হবে কেমন যেন একটা শন্‌ শন্‌ শব্দ হচ্ছে। কান পাতলে মনে হবে মাটি যেন কাঁদছে। মাটি না কাঁদলে, আকাশও কাঁদে না।

কেতকী এতক্ষণ চুপ করে জনার্দনের কথাগুলো শুনছিল। অদ্ভুত সব কথা। এর আগে তার কাছ থেকে এ-সব কথা কেতকী কোনও দিনই শোনে নি। কেতকীর মনে হল, জনার্দনের ভেতরে বোধহয় কান্নার পাহাড় জমে আছে?

ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে এসে কেতকী দেখল, টিপয়ের ওপর একখানা চিঠি। মা লিখেছেন।

নিমেষে চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল—হিমাংশুর মা কেতকীকে বউ করতে চায়। হিমাংশুর কাছে কেতকীর কথা তিনি অনেক শুনেছেন। সে সব শুনে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, হিমাংশু কেতকীকেই বিয়ে করতে চায়। তাই হিমাংশুর মা কেতকীর মাকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

কেতকী মুহূর্ত বিলম্ব না করে প্যাডটা টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। মাকে নয়, হিমাংশুবাবুকেই লিখল।

'সুভদ্রার কাছ থেকে বোধহয় আপনি সব সংবাদ পেয়েছেন। জনার্দন এখানেই কাজ পেয়েছে। এখন থেকে সে এখানেই থাকবে। সুবলের দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়েছে। তাছাড়া ছেলেটার 'মা' ডাক আমায় মুগ্ধ করেছে। সুতরাং অন্যদিকে মন দেবার মত সময় বা প্রবৃত্তি আর আমার নেই। আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার ব্রত উদযাপনে আপনার অমূল্য উপদেশ যে খুব কার্যকর হবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আপনার সহযোগিতা থেকে আশা করি কোনও দিনই বঞ্চিত হবো না।'

চিঠিটা মুড়তে মুড়তে বিছানায় শুয়ে পড়ল কেতকী। সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল। কোথা থেকে হুহু করে দু'চোখ বেয়ে কান্না নেমে এল। এতক্ষণে বুঝতে পারল কেতকী যে, তার ভেতরেও অনেক কান্না জমাট বেঁধে ছিলো।

মনে হল, শুকনো মাটির মত তারও বুকের ভেতরটা বোধহয় জীর্ণ হয়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে তার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু বেশীক্ষণ কাঁদতে পারল না, হঠাৎ আলোটা জ্বলে উঠল। কেতকী ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। দেখল, সুবলের হাতে একরাশ তাজা ফুল। পেছনে পেছনে জনার্দন এসে ঐ তাজা ফুলগুলো সাজিয়ে রাখল। তারপর একটা ধূপ জ্বেলে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু কেতকীর কান্নার সুর তার কানে ঝঙ্কার তুলল।

সুবল কিন্তু গেল না। হাতজোড় করে বলতে লাগল—

অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে…!

রাত্রি এলো। সুবল তার নতুন পাওয়া মায়ের কোল জুড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কেতকীর ঘুম আসে না। বাতাসের ঠাণ্ডা আমেজ চোখে মুখে এসে লাগে। অন্ধকার আকাশের বুক চিরে চিরে বিদ্যুৎ ঝলমলিয়ে ওঠে। বিছানা ছেড়ে এসে সে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ায়। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি এক সময় বড় বড় ফোঁটা হয়ে ঝমঝমিয়ে মাটির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শের জন্য কেতকীর যে মন এতকাল পীড়িত হচ্ছিল, সেই অবচেতন মনকে খুশীর বন্যাধারায় ভাসিয়ে দেয়।

তারপর একসময় রঙীন আলোয় পূর্বদিগন্ত রাঙা হয়ে ওঠে। নতুন দিনের নতুন পৃথিবী সুন্দর হয়ে দেখা দেয়।

কিন্তু জনার্দন নেই। এই বিপুলা পৃথিবীর মাধ্যে সে হারিয়ে গেছে। জনার্দন নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে। সুবলকে কেতকীর কাছে দিয়ে নিজেকে নিঃস্ব রিক্ত করে চলে গেল। মেঘ জল হয়ে ঝরে পড়ল। মাটির কান্না ঘুচল। আকাশ আর মাটির রূপান্তর জনার্দন বুঝি সহ্য করতে পারল না।

—